চকিত চমকে

বিনয়জীবন ঘোষ

ওয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

প্রথম সংস্করণ :
৭ই আশ্বিন,
১৮৮৫ শকাব্দ

টা ২ ৭৫
নং পঃ

প্রচ্ছদসজ্জা :
বিশ্বনাথ দাস

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৯২, মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর : ত্রিদিবেশ বসু
কে. পি বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

মা-মণি

স্বপ্নাকে—

নিবেদন

ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ জীবনে অনেক ঘাটের জল খেতে হয়েছে। চলার পথে নির্মল হাস্য-কৌতুকের যেসব টুক্‌রো চোখে পড়েছে তারই কিছু কিছু কুড়িয়ে, সাজিয়ে এখানে বিতরণ করেছি। বইটি পড়ে যদি কেউ নিমেষের তরেও ভুলতে পারে দুঃখ-বেদনা, ফুটে ওঠে কারও মুখে ক্ষণিকের ক্ষীণ হাসি—ধন্য মানবো নিজেকে। পরিশেষে ধন্যবাদ জানাই আমার বহুদিনের বন্ধু শ্রীত্রিদিবেশ বসুকে, যাঁর উৎসাহেই সম্ভব হয়েছে এই পুস্তিকা-রচনা—এবং যিনি স্বেচ্ছায় সানন্দে এর প্রকাশনের ভার নিয়েছেন।

১লা বৈশাখ, ১৩৭০

বিনয়জীবন ঘোষ

মধু-নির্ঝর

স্কুলে যাই হোক্, কলেজের সাধারণ ধারা ছাত্রদের জ্বালাতন ও দৌরাত্ম্যে অধ্যাপকরা নাস্তা-নাবুদ উস্তন-খুস্তন। সব নিয়মেরই আছে ব্যতিক্রম। আমার জীবনে চোখে পড়েছে দু'একটা ব্যতিক্রম। ক্লাস-সুদ্ধ ছাত্র ঘায়েল ও জখম গুরুদেবের 'জিহ্বার' দাপটে।

মধু-ঝরা রসনায় একক ও অদ্বিতীয় ছিলেন আমাদের স্বর্গীয় গুরুদেব, ডাঃ নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পি.-এইচ.ডি.। নিত্য-নিয়ত ছাত্র ও সহকর্মীদের উদ্দেশে তাঁর রসনা "ঝলি উঠে খড়্গ সম"। যেমনি ভাবের উগ্রতা, তেমনি ভাষার তীব্রতা তাঁর সকল কথাবার্তায়, সব মন্তব্যে।

ইতিহাসের এম্.এ. ক্লাসের ছাত্রদের তিনি পাঠশালার বালকের বেশী মর্যাদা দিতেন না। কোনও সহকর্মী অধ্যাপককেও ছেড়ে কথা বলতেন না।

সম্রাট পঞ্চম জর্জ সেসময় গুরুতর প্লুরিসি (Pleurisy) রোগে আক্রান্ত হয়ে মরমর হ'ন। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় ক্লাসে এসে পড়ানো আরম্ভ করার আগেই বললেন—স্টেট্স্ম্যান পত্রিকা আজকের সম্পাদকীয়তে লিখেছে যে সমগ্র ব্রিটীশ সাম্রাজ্য মহামান্য নৃপতির আরোগ্যের জন্যে প্রার্থনা করছে; কিন্তু আমি জানি জেলের চোর-ডাকাত

কয়েদীরা আর পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ছাত্ররা রাজার মৃত্যুর জন্য উদ্‌গ্রীব অধীর হয়ে উঠেছে—Felons and Post-Graduates are clamouring for the King's demise.

আমরা প্রতিবাদ জানালুম—স্যার, জেলের চোর-ডাকাত কয়েদীর সঙ্গে আমাদের এক পর্যায়ে ফেললেন!

তিনি উত্তর দিলেন: তোরা মিনিটে মিনিটে খবর নিচ্ছিস্‌না রাজা মরলো কিনা, এবং মরলে সাতদিন ছুটী পাবি কিনা? কয়েদীদের সাজা মকুব; তোদের ছুটী।

আমাদের সহাধ্যায়িনী ছিলেন মাত্র একজন বিবাহিতা মহিলা। ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাচীন ভারতে নারীর স্থান (Position of Women in Ancient India) বিষয়ে লেক্‌চার দিচ্ছেন,—অকস্মাৎ তাঁর ডানদিকে বসা ভদ্রমহিলার প্রতি মুখ ফিরিয়ে বেশ ক্রুদ্ধ স্বরেই বললেন—তোমরা এতটা কাল বলে আসছো যে আমরা পুরুষেরা তোমাদের ওপোর অত্যাচার করছি, অবিচার করছি। সময় ঘনিয়ে আসছে যখন আমাদেরও মওকা মিলবে ঐসব প্রীতি-সম্ভাষণ তোমাদের প্রত্যর্পণ করার। The time is soon coming when we will have an opportunity of returning to you the compliments.

মহিলাটি হতভম্ব! আমরা কৌতুক বোধ করলেও গুরুদেবের শানিত জিহ্বার ভয়ে নীরব।

আমাদের আর একজন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক প্রাচীন ভারতের

রাজনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে একটি সর্বজন-সমাদৃত প্রামাণ্য পুস্তক লিখেছিলেন। লেখক গভীর পণ্ডিত এবং আমাদের সময়ের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক। সেখানি অবশ্যপাঠ্য বলে বিবেচিত হোতো। ক্লাসে একদিন সেই বইখানার কথা উঠলো। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করলেন: Is that a book at all ? It is a catalogue ; second-hand material unintelligently handled by a third-rate brain.—ওখানা আবার একটা বই নাকি ; ওটা একটা ক্যাটালগ ; দু-হাত-ফেরতা উপাদান নিয়ে একটি তৃতীয় শ্রেণীর মস্তিষ্ক নির্বোধের মতো নাড়াচাড়া করেছে।

আর একজন অধ্যাপকের বিরুদ্ধে আমরা ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে নালিশ জানালুম যে, সেই অধ্যাপকটি কিছুতেই পরীক্ষায় ছেলেদের বেশী নম্বর দিতে চান্না। ডাঃ. বন্দ্যোপাধ্যায় টিপ্পনী কাটলেন: আরে, ওটা নিজে কখনও নম্বর পেয়েছে যে ছাত্রদের নম্বর দেবে ? এক একটা নম্বর দিতে ওর মনে হয় বাপের এক একটা তালুক বিকিয়ে যাচ্ছে।

সব বিষয়ে প্রফেসর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাক্য ও অনুভূতির ঝাঁঝ প্রচণ্ড। আর একদিন ক্লাসে এসেই বললেন—আমার বাবা হিন্দু-সম্মিলনীটার একজন প্রতিষ্ঠাতা। তাই ওরা আমায় ওদের বার্ষিক অধিবেশনে নেমন্তন্ন করে—আমিও যাই। এবার থেকে আর যাবোনা। কাল কলেজ থেকে ফিরে এবারের বার্ষিক সভার নেমন্তন্ন-চিঠিটা পেলুম।

সভাপতি করেছে বেহ্মো রামানন্দকে (পরম শ্রদ্ধেয়, খ্যাতিমান, 'প্রবাসী'-সম্পাদক ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়); even Moulana Mohammed Ali would have been a better President of the Hindu Sammelan.—এমনকি মৌলানা মহম্মদ আলীকে হিন্দু-সম্মিলনের সভাপতি করলে ওর চেয়ে ভাল হোতো।

কলিকাতা বিশ্ববিস্থালয়ের সেনেটের সভা হচ্ছে। সভার কোনও সিদ্ধান্তে ক্রুদ্ধ-বিরক্ত হয়ে মিণ্টো-প্রফেসর ডাক্তার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাইরে এসে বারান্দায় পায়চারি করছেন, আর নিকটস্থ লোকদের বলছেন এখানে সততা, ন্যায়-বিচার কিছুই নেই। ডাক্তার নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন—ডাক্তার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাগুলি শুনে মন্তব্য করলেন: আরে মশাই, আপনিও যেমন; সেনেটের সদস্যদের কাছে সততা, ন্যায়-বিচার প্রচার করাও যা, সোনাগাছিতে সতীত্বের গুণ গেয়ে বেড়ানোও তা।

অগ্নিতে ঘৃতাহুতি। কথাগুলো শুনে মিণ্টো প্রমথ আরও ক্ষেপে উঠলেন। ডাক্তার নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বিকার-ভাবে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে স্থানত্যাগ করলেন।

এম্.এ. পরীক্ষার পূর্বে ডাক্তার নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় শেষদিন ক্লাস নিচ্ছেন। আমরা জিগেস্ করলুম—স্যার, আপনার বিষয়ে (subject-এ) আমাদের কোন্ কোন্ বই পড়া অবশ্যকর্তব্য?

প্রশ্ন শুনে গুরুদেব কিছুক্ষণ উদাস নেত্রে সুমুখে চেয়ে

রইলেন ; তারপর সশব্দে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—তোরা আবার কি পড়বি, বাবা ; তোদের দেখলে আমার কান্না পায়।

সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলুম—কেন, স্যার ?

গুরুদেব—ওসব পড়ে আর কী হবে, বাবা ; প্রাচীন মৌর্য-রাষ্ট্র কি পুলিশ-রাষ্ট্র ছিল ? মেগাস্থিনিস-বর্ণিত রাষ্ট্র-কাঠামো ও কৌটীল্য-বর্ণিত রাষ্ট্র-কাঠামো কোথায় ভিন্ন, আর কোথায় অভিন্ন ? এসব বড় বড় গবেষণা কী কাজে লাগবে ? এম্.এ. পাস করে তো মাস গেলে ষাট-টাকার বদলে এই পোস্টো হতে ঐ পোস্টো করবে।

শেষের কথা ক'টি বলে তিনি টেবিলের ওপোর পর পর দুটি জায়গায় মুষ্ট্যাঘাত করতে লাগলেন : From this posto to that posto.

আমরা বললাম—ও-কথার মানে কী, স্যার ?

ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তর দিলেন—মানে বুঝতে পারলে না ? এম্.এ. পাস করে তো ষাট-টাকা বেতনের মনি-অর্ডার ক্লার্ক হবে।

ক্লাসের যারা ভাল ছেলে তারা বললে—সে কি স্যার ! এই কি আমাদের প্রতি আপনার শুভেচ্ছা ! জীবনে মনি-অর্ডার কেরানীর বেশী কিছু হতে পারবোনা।

অধ্যাপক উত্তর করলেন : ঐ যদি হতে পারো বাপ-চোদ্দ-পুরুষের ভাগ্যি ; নইলে ভেবেছ বুঝি এক এক জন ভাইসরয় অ্যাণ্ড গবর্নর-জেনারেল হবে !

গুরুদেবের বিদায়-আশিস শুনে ক্লাস-সুদ্ধ স্তম্ভিত।

কলেজ ছাড়ার পর ক'বছর বাদে মাত্র একবার গুরু-শিষ্য-সংযোগ ঘটেছিল। ভাগ্যচক্রের চরকী ঘোরার ফেরে কলিকাতা কর্পোরেশনে একটা নগণ্য চাকরিতে নিযুক্ত; ট্রামে যাচ্ছি; দেখি, পাশের সীটে বসে গুরুদেব ডাক্তার নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সাধারণ সৌজন্যবোধে নমস্কার ক'রে, জিগেস্ করলুম—স্যার, কোথায় যাচ্ছেন?

গম্ভীর গলায় উত্তর এলো—স্যার বলিয়া কেন করিলে সম্বোধন? ছাত্র ছিলে?

আমি পরিচয় দিলুম।

গুরুদেব জিগেস্ করলেন—এখন কি করছো?

জানালুম কলিকাতা কর্পোরেশনে একটা সামান্য চাকরি করি।

সঙ্গে সঙ্গে আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে জ্বলন্ত লাভা-স্রোত বেরিয়ে এলো: তুমি সেই মহা-পুণ্য-তীর্থস্থানের একজন পাণ্ডা হয়েছ; তুমি এখন নমস্য ব্যক্তি; তুমি কী আমায় নমস্কার করবে; আমি তোমায় শত শত নমস্কার জানাই; (গুরুদেব যথার্থই দু'হাত জোড় করে বারবার নমস্কার করলেন) কী এমন অপরাধ করেছিলুম, বাবা; আমার পিতা সারা জীবন এই শহরেই মাস্টারি করে গেলেন; আমিও আজ ত্রিশ বছর তাই করছি; ভেবেছিলুম মাথা গোঁজার একটু ঠাঁই করে নিই; কাঠা চারেক জমি গস্ত করেছিলুম; তারপরে পড়লুম তোমাদের খপ্পরে; চার বছর ধরে প্ল্যানের পর প্ল্যান—সাতখানা প্ল্যান

দিলুম—হাঁটাহাঁটিতে পাঁচ জোড়া জুতো ক্ষয়ে গেল—প্ল্যান কিন্তু আর পাস হোলোনা। এখন ঠিক করেছি মাটীর দরে জমির টুকরো বেচে দেব। খদ্দের না জুটলে, এমনি কাউকে দান করবো, তবু তোমার আওতায় বাস করবোনা। I would rather live in the company of snakes and tigers in the *Sunderbans* than under the jurisdiction of your Corporation—তোমার কর্পোরেশনের চৌহদ্দীর মধ্যে থাকার চেয়ে বরং আমি সুন্দরবনের সাপ আর বাঘের সঙ্গে বাস করবো। উইলে আমার পুত্র-পৌত্রদের শেষ অনুরোধ জানিয়ে যাবো তারা যেন কলিকাতা কর্পোরেশনের হুদ্দোর মধ্যে কখনও না বাড়ী করে।

গুরুদেবের তর্জন-গর্জনে ট্রামের সকলের দৃষ্টি আমার ওপোর, এবং চতুর্দিক থেকে কর্পোরেশনের উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের রকেট আমায় বিঁধছে। ভাবছি কী কুক্ষণে গুরু-সম্ভাষণের শনি আমার মাথায় চেপেছিল। তাঁকে শান্ত করার ইচ্ছায় আমি বললুম—স্যার, প্লট-নম্বর আর মালিকের নামটা আমায় একবার দেবেন, আমি একবার চেষ্টা করে দেখবো।

মন্তব্য করলেন—কত কত হাতী গেল তল, মশা বলে কত জল।

আমি আবার অনুরোধ জানালে বললেন—দাঁড়াও, এমাসের মাইনেটা পাই।

এবার আমার মেজাজ বিগড়ে গেল ; বললুম ঃ এ কথাটা

বলা আপনার কি ঠিক হোলো, স্যার ; আমি আপনার ছাত্র ; আমি আপনার একটা কাজ করে দিলে তার জন্যে কি আপনাকে টাকা দিতে হবে ?

ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তর করলেন : ভুল বুঝিলে, বৎস ; এবার তোমার কাছে কিছুদিন হাঁটাহাঁটি করতে হবে ; সেজন্যে আর এক জোড়া নতুন জুতো কিনতে হবে ; হাতে টাকা নেই ; মাইনে পেলে জুতো জোড়া কিনে তোমার দ্বারস্থ হবো।

এরপর প্লট-নম্বরটা ও মালিকের নাম একটা স্লিপে লিখে দিলেন। মালিক তাঁর পত্নী।

আমি বললুম—স্যার, আপনি একবারও আমার কাছে যাবেন না, এবং আমার কাছে খোঁজও নেবেন না। আমি যদি কিছু করতে পারি নিজে গিয়ে আপনাকে জানিয়ে আসবো।

তিনমাস চেষ্টা ও ধরাধরির পর প্ল্যানটা পাস হোলো। একটা ছুটীর দিন তাঁর বাড়ী গেলুম জানাতে। দুপুরবেলা বসে বই পড়ছেন। আমি যেই বললুম আপনার প্ল্যানটা পাস হয়ে গেছে, মন্তব্য করলেন : দ্যাখো হে ছোকরা, আমি কি তোমার ইয়ার-বন্ধু ; ছুটীর দিনে এ-পাড়ায় কোথা আড্ডা দিতে এসেছিলে ; ভাবলে আমার সঙ্গে একটু মস্করা করে যাবে।

আমি রেগে উঠে পড়লুম ; বললুম—আপনার মতন লোককে খবর দিতে আসাই ঝকমারি ; যাক্‌গে, যখন কর্পোরেশনের কাছ থেকে চিঠি পাবেন তখন বুঝবেন ওটা সত্যিই পাস হয়ে গেছে।

আমি দরজার দিকে এগুতে গুরুদেব বললেন : বোসো ; তোমার ব্যবহারে বুঝতে পারছি প্ল্যানটা এবার পাস হয়েছে ;

তুমি তো, বাবা, এযুগের একলব্য ; কত বড় কাজ যে আমার করলে ! এমন সুখবর আনলে, মিষ্টিমুখ করে যেতেই হবে।

উঠে ভিতরে গেলেন ; খানিক বাদে দুটো বড় থালা-ভর্তি সন্দেশ এলো। আমায় বললেন : খাও।

আমি বললুম—স্যার, আপনার সব বিষয়েই অতিশয়ের দিকে ঝোঁক—কী কথায়, কী কাজে।

গুরুদেব উত্তর দিলেন : তুমি যে কাজ করেছ, দশ থালা সন্দেশ তোমায় খাওয়াতে ইচ্ছে হচ্ছে।

তাঁর পীড়াপীড়িতে বেশ কয়েকটা সন্দেশ খেতে হোলো।

এইসঙ্গে আর একজন গুরুদেবের কথা মনে পড়ে যিনি জিবের জোরে ক্লাস-সুদ্ধ ছেলেকে টিট্ রাখতেন—স্কটীশ চার্চ কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক, কালী পণ্ডিতমশাই। তিনি ছাত্রদের অনর্গল ছড়া বেঁধে গাল দিতেন—যেমন : উল্লুক-ভল্লুক-বেল্লিক, নচ্ছার-দুরাচার-কুলাঙ্গার, ছুঁচো-বুঁচো-পেঁচো ইত্যাদি।

একটি ছেলে একদিন ক্লাস আরম্ভ হওয়ার মিনিট পনেরো পরে ক্লাসে ঢুকলো। কালী পণ্ডিতমশাই সোৎসাহে তাকে স্বাগত জানিয়ে বললেন : এসো বাবা, এসো ; তোমার দেশ কী সোনার দেশ, বাবা ; আমি ভাবছি ওখানে গিয়েই থাকবো।

ভ্যাবাচাকা খেয়ে ছাত্রটি বললে—স্যার, আমার দেশ কোথায় আপনি কি করে জানলেন।

পণ্ডিতমশাই—জানিনা বাবা ? তোমার দেশ সোনার দেশ ; সেখানে কাক-চিল নেই।

ছাত্র—কী যে বলেন, স্যার; আমার বাড়ী মালদা', কাকের উৎপাতে আমরা অস্থির।

কালী পণ্ডিতমশাই—তা কি হয়, বাবা; নইলে বেলা এগারোটায় তোমার ভোর হয়, ঘুম ভাঙে; এই বুঝি ক্লাসে আসার সময়—হতভাগা—হাঁদা-গাধা।

চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে সংস্কৃত পড়াচ্ছেন কালী পণ্ডিতমশাই—শকুন্তলা নাটক। নীতিন উঠে প্রশ্ন করলে: স্যার, প্রাচীন ভারতে তো নারীর অবরোধ-প্রথা ছিলনা; এই নাটকেরই পরের দৃশ্য থেকে বোঝা যায় সেযুগে মুনি-ঋষিদের আশ্রমেও যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশা, এমনকি যথেচ্ছ প্রেমালাপেও বাধা ছিলনা। তবে রাজা দুষ্মন্ত প্রথম তপোবনে এসে গাছের আড়ালি থেকে চোরের মতো লুকিয়ে-লুকিয়ে শকুন্তলা, অনসূয়া, প্রিয়ম্বদাকে দেখলেন কেন? সোজা সুমুখে গিয়ে আলাপ জুড়ে দিলেই পারতেন।

কালী পণ্ডিত—বাবা নীতিন, এমন সূক্ষ্ম, সরস সরেস প্রশ্ন তোমার মগজে গজাবেনা তো, আর কার মগজে গজগজ করবে, বাবা। আচ্ছা, বাবা নীতিন, ঐ-যে হেদোর উল্টো দিকের কলেজটায় শাড়ীর আঁচলের পেখম নাচিয়ে যেসব হুরী-পরীরা এযুগে আসে তারাও তো, বাবা, বোরখা-ঢাকা পর্দানশীন জেনানা ন'ন। তবে তুমি কেন, বাবা, প্রায় প্রত্যহই তাদের কলেজ আসা-যাওয়ার সময়টা হেদোর ভিতরের বেড়ার ছোট ছোট গাছগুলোর আড়ালে আড় হয়ে শুয়ে বক কিংবা জিরাফের মতো ঘাড় উঁচু করে লুকিয়ে লুকিয়ে চোরের লুব্ধ দৃষ্টি হানো।

কলেজের ফটকটার সুমুখে দাঁড়ালে হয়তো দারওয়ানরা ধরে পেটাবে বলে ভয় হতে পারে; কিন্তু হেদোর ধারের ফুটপাতটায় বীরের মতো বুক ফুলিয়ে 'দাঁড়াও, তোমায় দেখি' ভাবে চেয়ে থাকলে পারো তো।

গুরুদেবের কথা শুনে বিস্ময়-বিমূঢ় নীতিন বললে—এ কী বলছেন, স্যার; আমি ওরকম করি; কক্ষনো নয়।

কালী পণ্ডিত—হ্যাঁ; তুমিই; তুমি শ্রীমান—মূর্তিমান—হনুমান নীতিন নন্দী।

নীতিন—কে এমন বাজে কথা আপনাকে বললে?

কালী পণ্ডিত—(নিজের দুটি চোখে আঙুল দিয়ে) এই দুটি আঁখি-তারা।

নীতিন—গুরু হয়ে আপনি ছাত্রের নামে এরকম নির্জলা মিথ্যে অপবাদ দিচ্ছেন, স্যার!

কালী পণ্ডিত—ওরে আমার কী একলব্য রে! ভারি গুরু-ভক্তি দেখছি; গুরু যখন ক্লাসে পড়াচ্ছে—তার সঙ্গে বাজে ফষ্টি-নষ্টি করা বুঝি ছাত্রের মহান ও পবিত্র কর্তব্য! চুপ করে বোস্—ফিচেল—ফাজিল—ফক্কড়—লোচ্চা-লক্কড়।

কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার কালী পণ্ডিতমশাই ও নবাগত স্কচ প্রফেসর প্রসঙ্গ। স্কটল্যাণ্ড থেকে নতুন কোনও প্রফেসর এলেই প্রিন্সিপাল ওয়াট্ সাহেব তাঁকে কালী পণ্ডিত-মশাই-এর কাছে চলনসই মতো বাংলাভাষা শিখে নিতে বলতেন। পণ্ডিতমশাই তাই বরাবর স্কচ প্রফেসরদের বাংলার শিক্ষক ছিলেন। আমাদের সময় ফ্রেজার সাহেব নতুন

এলেন ইতিহাস পড়াতে। বাংলা শিখতেন পণ্ডিতমশাই-এর কাছে।

একেবারে বাংলা বোঝেনা নতুন কোনও সাহেব পেলেই কিছু কিছু ছাত্র সুমুখেই তাঁকে 'শালা' সম্বোধন করবেই ; এই ছিল রেওয়াজ। প্রথমবার ফ্রেজার সাহেব কালী পণ্ডিতের কাছে গিয়ে জিগেস্ করলেন : পণ্ডিত, একজন ছাত্র আমার দিকে চেয়ে বললে 'শালা' ; ও-কথাটার অর্থ কী ?

কালী পণ্ডিতমশাই হেসে গড়িয়ে পড়লেন, বললেন— সাহেব, তুমি তো অল্পদিনের মধ্যেই ছাত্রদের খুব প্রিয় হয়ে উঠেছো ; তোমাকে ওরা এরি মধ্যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মতো দেখছে ; ও-কথাটা তাই বোঝায় ; ছাত্র-হৃদয়-জয়ে এই অসামান্য সাফল্যের জন্যে তুমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করো।

খুশীতে একগাল হেসে পণ্ডিতমশাই-এর সঙ্গে করমর্দন করে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফ্রেজার সাহেব চলে এলেন।

কিন্তু 'শালা' বাক্যটি মাঝে মাঝেই তাঁর প্রতি নিক্ষিপ্ত হতে লাগলো। ক্রমশঃ সাহেবের মনে সন্দেহ জাগলো কথাটার অর্থ খারাপ কিছু। আবার গেলেন কালী পণ্ডিতমশাই-এর কাছে 'শালা' কথাটার ঠিক অর্থ কী জানতে।

পণ্ডিতমশাই বললেন—সাহেব, আমি যা বলেছি তা ঠিক ; ছেলেরা তোমায় খুব পছন্দ করছে, প্রিয়জনের মতন দেখছে তোমায় ; বলতে কী, তোমার সঙ্গে একটি মধুর সম্পর্ক পাতাতে তারা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। 'শালা'র অর্থ—তোমার ভগ্নীকে বিবাহ করার অভিলাষ জানাচ্ছে।

সাহেব বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলেন : What! একী বিশ্রী ব্যাপার! অতি অশোভন ও কুৎসিত মনোভাব! আমরা দেশে শুনতাম ভারতীয় ছাত্ররা অধ্যাপকদের গুরু বলে গভীর ভক্তি করে ; তার বদলে আমায় কোনও কোনও ছাত্র 'শালা' বলছে ; বড়ই দুঃখ পেলুম ; আমার ভগ্নী স্কটল্যাণ্ডে, তাকে নিয়ে এরা কথা বলে কেন ?

বেয়াড়া রসিক ছিলেন স্কটীশ চার্চ কলেজের প্রখ্যাত প্রিন্সিপাল ডাঃ ওয়াট্ স্বয়ং। অধ্যাপক রায়চৌধুরী স্কটীশ চার্চ কলেজ ছেড়ে বেথুন কলেজে বিজ্ঞানের লেক্চারার হয়ে চলে যাচ্ছেন। তাঁর বিদায়-সম্বর্ধনায় সভাপতি ডাঃ ওয়াট্ ভাষণ দিলেন : কেউ আমাকে, এবং আমার কলেজ ছেড়ে অন্যত্র যান এটা আমি মোটেই পছন্দ করিনা ; জিনিসটা আমার আদৌ ভাল লাগেনা। অধ্যাপক রায়চৌধুরী বেথুন কলেজে চলে যাচ্ছেন ; ওঁর যদি মেয়েদের পড়াতে এত সখ সে-কথা আমায় আগেই জানালে পারতেন ; আমিই এখানে তাঁর ক্লাসের অর্ধেক মেয়েতে ভর্তি করে দিতুম—I would have half-filled his classes with ladies here.

হল্-সুদ্ধ ছাত্র-অধ্যাপক এই কথা শুনে হাসির রোল তুললে। অধ্যাপক রায়চৌধুরী লজ্জায় অধোমুখ। সেদিন ডাঃ ওয়াট্ ঠাট্টার ছলে যে-কথা বলেছিলেন, কিছুকাল পরে স্কটীশ চার্চ কলেজের বাস্তব রূপ তাই হয়—প্রতি ক্লাসের অর্ধেকই ছাত্রী।

ওয়াট্ সাহেবের আর এক কাণ্ড আরও মজার। আমাদের সময়ে সর্বসাকুল্যে কলেজে আধ ডজন মেয়ে পড়তেন। বি.এ. তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে একজন ছাত্রী ছিলেন। বর্মী খ্রীষ্টান মেয়ে —মিস্ বা-থীন। মেয়েরা অধ্যাপকদের সঙ্গে ক্লাসে আসতেন। চিরকুমার, নামকরা অধ্যাপক প্রফেসর গুপ্ত ইংরেজি পড়াতেন।

একদিন প্রফেসর গুপ্ত মিস্ বা-থীনকে সঙ্গে করে যেই ক্লাসে ঢুকলেন ছাত্ররা উলু-উলু দিয়ে উঠলো। প্রফেসর গুপ্ত রেগে ক্ষেপে গেলেন। ছেলেদের যাচ্ছেতাই বকাবকি আরম্ভ করলেনঃ কী ভীষণ অশোভন অভদ্র ব্যবহার; তোমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত নিজেদের বাঁদরামোর জন্যে। ক্লাস-সুদ্ধ সকলের ক্ষমা ভিক্ষা করতে হবে এই কদর্য কাণ্ডের দরুন। সৎসাহস থাকলে একে একে উঠে মার্জনা চাও।

কা কস্য পরিবেদনা! ছেলেরা নির্লিপ্ত নির্বিকার বসে রইল।

রাগ বাড়তে, অধ্যাপক গুপ্ত টেবিলের উপর চ'ড়ে হাত-পা নেড়ে ছেলেদের অনুতাপ করতে বারংবার অনুরোধ জানালেন।

ছাত্ররা নট্-নড়ন-চড়ন, চুপচাপ গ্যাঁট হয়ে বসে।

তড়াক করে টেবিল থেকে লাফ দিয়ে নেমে প্রফেসর গুপ্ত বিষম রেগে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে বেগে।

ক'মিনিট পরে প্রিন্সিপাল ওয়াট্‌কে সঙ্গে করে ফিরলেন।

অধ্যাপক গুপ্ত প্রিন্সিপাল ওয়াট্‌কে বললেনঃ আমার নিজের জন্যে তেমন নয়, কিন্তু এই ভদ্র যুবতীটির কথা ভেবে দেখুন। কী ভীষণ পীড়াদায়ক কুৎসিত পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হোলো বেচারাকে ছাত্রদের এই জঘন্য আচরণে।

ডাঃ ওয়াট্ মেয়েটিকে জিগেস্ করলেন: মিস্ বা-থীন তুমি কি মনে করো ছেলেদের এই অর্বাচীন কাণ্ডতে তুমি সত্যিই প্রফেসর গুপ্তের সঙ্গে উদ্‌বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছো ?

খিল্‌খিল্ করে হেসে মিস্ বা-থীন উত্তর দিলেন—মোটেই না ; মোটেই না।

ডাঃ ওয়াট্ অধ্যাপক গুপ্তের দিকে ফিরে বললেন : শুনলেন তো ; মিস্ বা-থীন মনে করছে সে আগের মতোই সম্পূর্ণ বন্ধন-মুক্ত আছে। ওর খুশীর ভাব দেখে আমার মনে হচ্ছে ব্যাপারটা অন্যরকম দাঁড়ালেও ওর বিশেষ আপসোস হোতোনা।

এই বলে হো-হো করে হাসতে হাসতে ডাঃ ওয়াট্ বেরিয়ে গেলেন। প্রিন্সিপালের কথা শুনে ছেলেরাও হাসিতে ফেটে পড়লো।

ব্যাপারটার শেষ পরিণতি দেখে প্রফেসর গুপ্ত হতভম্ব ; খানিকক্ষণ গুম্ হয়ে বসে থেকে গম্ভীরভাবে ভারি গলায় পড়াতে শুরু করলেন।

রোয়াবী বেকার

বিশ্বনাথ পরে কল্‌কাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট হয়েছে—পসারও জমেছে।

কিন্তু কথা হচ্ছে অনেকদিন আগের। ইতিহাসে এম্.এ.-টা দিয়ে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত দুর্ভাগ্যের জন্যেই বলতে হবে বিশ্বনাথ থার্ডক্লাস পেলে। ভবিষ্যৎটা মাটি হওয়ার যোগাড়। দুড়ুম্ করে পরের বছরেই পলিটিক্‌স্-এ এম্.এ. দিলে। ভদ্রলোকের এক কথা। সে-পরীক্ষাতেও একই ফল। চাকুরীর খোঁজ করছে বিশ্বনাথ প্রাণপণে—জুটছেনা একটাও। বিশ্বনাথ বাধ্য হয়েই কিছুকাল বেকার। বিশ্বনাথের মন-মেজাজের অবস্থাটা সহজেই অনুমেয়।

এই পরিস্থিতিতে কয়েকটা ঘটনার কথা বলছি।

বিশ্বনাথ চলেছে হন্‌হন্ করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ীর পাশ ঘেঁষে। বিশ্বনাথের দু'জন খ্যাতনামা অধ্যাপক সুমুখে পড়লেন; মাস্টারমশাইরা স্বভাবজাত স্নেহে ছাত্রকে প্রশ্ন করলেন: বিশ্বনাথ, তুমি এখন কি কোরছো?

তুবড়ি-ফাটা উত্তর হোলো—You won't die or retire to make room for better people—আপনারা মরবেনও না, সরবেনও না আপনাদের চেয়ে ভাল লোকদের স্থান দেওয়ার জন্যে; অতএব আমার আর কি হবে বলুন।

ট্রামে চড়ছে বিশ্বনাথ; উঠতেই ষষ্ঠ-বার্ষিক শ্রেণীর এক ছাত্র জিগেস্ করলে—বিশ্বনাথদা, তুমি এখন কি করছো?

বিশ্বনাথের মধুর প্রত্যুত্তর: এমন কিছু অন্যায় বা পাপ করছিনা; তুমি দু'বছর বাদে যা করবে আমি তাই করছি।

বন্ধু বিয়েতে নিমন্ত্রণ পাঠালে বিশ্বনাথকে। উত্তর গেল: যেতে পারবোনা; একে বেকারী, তার ওপোর social taxation—সামাজিক ট্যাক্সের বোঝা বইবার ক্ষমতা নেই; মাপ কোরো।

বন্ধু বেচারা ছুটে এলো বিশ্বনাথের বাড়ী, অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে হাতে পায়ে ধরে বিশ্বনাথকে বিবাহ-বাসরে যোগ দিতে রাজি করলে।

সম্পর্কে এক মেসোমশাই-এর বাড়ী যায় বিশ্বনাথ। তিনি কথায় কথায় রোজই বেশ রসিয়ে মজিয়ে শোনান্—তাই তো বিশ্বনাথ, দু'দুটো এম্.এ. পাস করেছ, তবু একটা চাকরি জুটলোনা। আমরা মোটে একটা পাস করে ত্রিশটাকায় ঢুকেছিলুম; এখন মাস গেলে পাঁচশ'টা টাকা তো ঘরে আনছি।

সেদিন হঠাৎ বিশ্বনাথ গিয়ে মেসোকে প্রথমেই জানালে: মেসোমশাই, শুনে নিশ্চয় আপনার মনটা খুবই খারাপ হয়ে যাবে, কিন্তু আমি একটা চারশ' থেকে হাজার পর্যন্ত মাইনের চাকরি পেয়ে গেছি।

মেসোমশাই রাগ ও বিরক্তি চেপে বললেন: এ কী বোলছো, বাবা! এ তো ভারি আনন্দের কথা—তবে তুমি

যে বললে শুনে আমার মন খারাপ হবে? এখনকার ছেলেদের কথাবার্তা মতিগতি বোঝা ভার।

আসলে বিশ্বনাথ তখনও বেকার।

কল্‌কাতার কয়েক মাইল দূরে একটা স্কুলের তৃতীয় বা চতুর্থ মাস্টারের পদের জন্যে একটা দরখাস্ত করলে বিশ্বনাথ। মতলব মাসকয়েক মাত্র মাস্টারিটা করার; তার মধ্যে ভাল একটা কিছু জুটিয়ে নেবে। সেই মাস্টারি পদের পক্ষে বিশ্বনাথের যোগ্যতা অনেক বেশী। যে ক'খানা দরখাস্ত পড়েছিল তার মধ্যে ডবল এম্.এ. দূরে থাকুক, আর কোন এম্.এ.-ই ছিলনা। মুশকিল হোলো সেই স্কুলের হেডমাস্টার নিজে মাত্র বি.এ.; তার ওপোর তাঁর নিজের একজন লোককে চাকরিটি দিতে চান। তিনি বিশ্বনাথকে বললেন—আপনার ডিগ্রী তো অনেক; আপনার মতো লোক পাওয়া বিশেষ সৌভাগ্য; কিন্তু দেখছি আপনি ইতিহাস ও রাজনীতির এম্.এ.। আমাদের দরকার ইংরেজি পড়াবার লোক।

বিশ্বনাথ বললে—ও বুঝেছি; দয়া করে আমার দরখাস্তটা একবার দিন্ তো।

দরখাস্তটা নিয়ে বিশ্বনাথ যেখানে লিখেছিলো "আমি অমুক সনে বি.এ. পাস করি", সেই পর্যন্ত রেখে, তারপরে যেখানে ছুটো এম্.এ. পাসের কথা লিখেছিল সে-লাইনগুলো কেটে দিলে। প্রধানশিক্ষক মহাশয়কে দরখাস্তখানা ফেরৎ দিয়ে বিশ্বনাথ বললে—এবারে দেখুন দেখি, আমায় এখন এই স্কুলের হেডমাস্টারও নিয়োগ করা চলবে।

SAROJINI IS IRRESISTIBLE

(সরোজিনী দুর্নিবার)

একটি খুব চালু সংস্কৃত উদ্ভট-শ্লোক হচ্ছে—

> এক-ভার্যা প্রকৃতি মুখরা, চঞ্চলা চ দ্বিতীয়া,
> পুত্রোঽপ্যেকো ভুবনবিজয়ী মন্মথদুর্নিবারঃ।
> শেষং শয্যা, বসতি জলধৌ, বাহনং পন্নগারিঃ,
> স্মারং স্মারং স্বগৃহচরিতং দারুভূতো মুরারিঃ॥

শুধু কামদেবই দুর্নিবার ন'ন; কামিনীও ভুবন-বিজয়িনী দুর্নিবার। তাও কাম-কান্তা রতিদেবীর মতো চোখ-ঝলসানো রূপসী না হয়েও। বপুর বিশালত্বে, ব্যক্তিত্বের বিরাটত্বে, ভাষার কবিত্বে, রসনার ওজস্বিতায় মহীয়সী মহিলাও দুর্নিবার। তাও যে-সে পুরুষের বিরুদ্ধে নয়—একেবারে মহত্ত্বের হিমালয়ের বিপক্ষে অভিযানেও।

১৯৩৮ সালই হবে। মহাত্মা গান্ধী স্বর্গত শরৎচন্দ্র বসুর ১নং উডবার্ন পার্কের বাসভবনে অধিষ্ঠান করছেন বেশ কয়েক সপ্তাহ। নিখিল ভারত কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন চলছে ঐ বাড়ীতেই। মহাত্মা গান্ধী ছাড়াও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রমুখ আরও কয়েকজন ভারতের শীর্ষস্থানীয় নেতা অবস্থান করছেন সেখানেই।

সরাইকেলা নৃত্যদল সেই সবে প্রকাশ্য আসরে নামার

জন্যে তৈরী হচ্ছে। বিখ্যাত প্রযোজক, পরলোকগত হরেন ঘোষের মাথায় ঢুকলো প্রথমেই মহাত্মা গান্ধীকে সরাইকেলা নৃত্য দেখাবেন। তাঁর আশিস-বাণী ও প্রশংসাপত্র সহ নাচের দল সাধারণের দরবারে হাজির হবে।

বিশ্ববরেণ্য দেশনেতার বিশ্ব-বিশ্রুত প্রাইভেট সেক্রেটারি—মহাদেব দেশাই। পোশাক-আশাক, চাল-চলনে মহাদেব মোটেই মহাদেবের পর্যায়ে ন'ন; বর্তমান যুগের যীশুখ্রীষ্টের অন্যতম প্রধান শিষ্য বলে বাইরে থেকে মালুম হয়না। ঘুরছেন, ফিরছেন, কথা বলছেন, নির্দেশ দিচ্ছেন—যেন কোনও সেনানী রণক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করছেন। ধব্‌ধবে সাদা খদ্দরের পায়জামার ওপোর ধব্‌ধবে সাদা খদ্দরের মিলিটারি শার্ট, ধব্‌ধবে সাদা গায়ের রং, ধব্‌ধবে সাদা গোঁফজোড়া—দীর্ঘদেহী, সুঠাম, সুপুরুষ।

হরেন ঘোষ সর্বাগ্রে ধর্না দিলেন তাঁর কাছে—মহাত্মাকে নাচ দেখাবার একটু সময় করে দিতে হবে এরি মধ্যে এক সন্ধ্যায়। বহু পীড়াপীড়ি, অনুনয়-বিনয়ের উত্তরে মহাদেব দেশাই একটির বেশী কথা খরচ করলেন না: অসম্ভব।

অগত্যা নাছোড়বান্দা শিল্প-উদ্যোক্তা সুভাষবাবুকে (নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে) ধরলেন। এখানে মিললো হৃদয়-বিদারক প্রত্যাখ্যান: ঐ হুম্‌দো হুম্‌দো মিন্‌সেগুলো ধেই ধেই করে নাচবে—তাই বসে বসে দেখতে হবে—সব গুরুতর জরুরী কাজ ফেলে?

শরৎবাবু প্রস্তাবটি সহানুভূতি সহকারে গ্রহণ করলেও সকলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে ভরসা পেলেন না।

মরিয়া হয়ে হরেন ঘোষ এক ফাঁকে সোজা খোদ মহাত্মাজীর কাছেই তাঁর আর্জি পেশ করলেন। হেসে, মৃদু ঘাড় নেড়ে মহাত্মাজী জানালেন তিনি বড়ই দুঃখিত, কিন্তু হরেন ঘোষের প্রস্তাবে তাঁর সায় দেওয়া একেবারেই সম্ভব নয়।

সবাই ধরে নিয়েছি হরেন ঘোষের প্ল্যান ভেস্তে গেল। এমন সময়; সকাল ন'টা হবে। মহাত্মাজী দোতলার পশ্চিমের বড় ঘরটায় বসে হাঁটুর ওপোর কাগজ রেখে 'হরিজন পত্রিকা'র জন্য প্রবন্ধ লিখছেন; ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকলেন বিপুলা প্রবলা অবলা শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু।

ইংরাজী বাক্যধারার নায়গ্রা-প্রপাত ভেঙে পড়লো মহাত্মার উপর। ভাষার ও কণ্ঠের সে কী অপূর্ব ধমক, গমক, চমক!

—তুমি কি ভেবেছ একটা জাত বেঁচে থাকবে শুধু তোমার চরখা আর খাদি নিয়ে। একটা জাতকে বাঁচার মতো বাঁচতে গেলে তার চাই শিল্প, সঙ্গীত, নৃত্য। জাতির নেতা হিসেবে তোমার পবিত্র কর্তব্য সর্বপ্রকার দেশীয় শিল্পকলাকে উৎসাহ দেওয়া। সরাইকেলা নৃত্য জাতীয় কৃষ্টির একটি অমূল্য সম্পদ।

বাক্যের বজ্রগর্জন চলেছে; মহাত্মাজী মাঝে মাঝে চোখ তুলে চাইছেন, ফোকলা গালে ফিক্ ফিক্ করে একটু হাসছেন, তারপরে আবার লেখায় মন দিচ্ছেন।

ভারতের নাইটিঙ্গেল যখন বেশ খানিকক্ষণ তাঁর উচ্চগ্রাম সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন, মহাত্মা গান্ধী হেসে বললেন—আচ্ছা, কাল সন্ধ্যে সাতটা থেকে ন'টা।

যেমন ঝড়ের মতন এসেছিলেন তেমনি ঝড়ের মতন চলে গেলেন শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু। হরেন ঘোষকেও উপদেশ দিলেন সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করতে, ও তৎক্ষণাৎ সে-বাড়ী ত্যাগ করতে।

—আর এক মুহূর্ত এখানে দাঁড়িওনা; দশজনে মিলে আবার বুড়োর 'হাঁ'-কে 'না' করে দেবে।

পরের দিন সন্ধ্যায় সরাইকেলা নৃত্য হবে শুনে সুভাষবাবু রেগে-মেগে মহাত্মাজীর কাছে এসে জিগেস্ করলেন—বার বার প্রত্যাখ্যান করার পর আবার কেন নাচ দেখতে রাজি হলেন?

একগাল হেসে মহাত্মাজী বললেন—Sarojini is irresistible (সরোজিনী তুর্নিবার)।

ILL—ILLER—ILLEST

(স্বাস্থ্য ভেঙেছে—আরও ভেঙেছে—ভেঙে চুরমার)

শচীনবাবু আমাদের চেয়ে দু'তিন বছর ওপোরে পড়তেন। আমরা যখন শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট মেসে, তখন তিনি সংস্কৃতে এম্.এ. পাস করে দর্শনে এম্.এ. দেওয়ার জন্যে তৈরী হচ্ছেন। উত্তরকালে শচীনবাবু পি.-এইচ.ডি. এবং একটা কলেজের প্রিন্সিপাল হ'ন শুনেছি।

আমার সঙ্গে শচীনবাবুর যোগ নস্যি নেওয়ার মাধ্যমে। কখনও কখনও শচীনবাবু আসতেন আমার ঘরে এক টিপ নস্যি নিতে। ঘণ্টা দুই সময় গড়ে কাটতো দু'জনের এই এক টিপ নস্যি দেওয়া-নেওয়া কেন্দ্র করে। আমিও মাঝে মাঝে যেতুম শচীনবাবুর ঘরে এক টিপ নস্যি নেওয়ার উপলক্ষ্যে; ঘণ্টা তিনেকের আগে নস্যি নেওয়ার পালা শেষ হোতোনা দু'জনের। কী পরিমাণ আড্ডা-লোভী হৃদয় এই দুই নস্যিবাজের এই থেকেই বোঝা যাবে।

শচীনবাবুর ব্যাচের (batch-এর) এম্.এ. পরীক্ষা চলছে। দু'তিন দিন পরীক্ষা হয়ে গেছে।

দুপুর তিনটে নাগাদ একদিন গোলদীঘির ভিতর দিয়ে শর্ট-কাট (short-cut) করছি—হ্যারিসন রোডের (এখন মহাত্মা গান্ধী রোড) মোড়ে যাওয়ার জন্যে। দেখি, একটি

বেঞ্চে বসে শচীনবাবু নির্বিকারচিত্তে নাকে নস্যি টানছেন। অবাক হয়ে বসে পড়লুম পাশে।

—এ কী! এখন এখানে বসে আছেন? পরীক্ষার কী হোলো?

—পরীক্ষা তো আমি এবছর দিচ্ছিনা।

—কিন্তু রোজ ঠিক সময়ে খেয়ে অন্য পরীক্ষার্থীর সঙ্গে বেরিয়ে আসেন; আবার তাদের সঙ্গেই মেসে ফেরেন। আমরা তো কেউ টের পাইনি আপনি পরীক্ষা দিচ্ছেন না।

—কেউ যাতে টের না পায় তাইতো এই ব্যবস্থা করেছি। ওদের সঙ্গে খেয়ে বেরিয়ে পড়ি; ওরা যায় পরীক্ষার হলে; আমি রয়ে যাই গোলদীঘির মুক্ত হাওয়ায়, বাগানের মনোরম পরিবেশে। মাঝে মাঝে চা খেতে যাই 'ফেভারিট কেবিনে'। পরীক্ষা শেষ হলে ওদের পিছু নিয়ে মেসে ফিরি।

খানিকটা কথাবার্তার পর আমি জিগেস্ করলুম—আমরা টের পেলেও যা, না পেলেও তা। কিন্তু আপনার বাবা কি জানেন আপনি এবছর পরীক্ষা দিচ্ছেন না?

শচীনবাবু বললেন—বাবাকে ম্যানেজ করেছি—চাইলড্স্ ঈজি গ্রামার-এ (*Child's Easy Grammar*-এ) পড়া—একটা সোজা গৎ দিয়ে।

—কী রকম!

—Ill, Iller, Illest. পরীক্ষার ঠিক মাসখানেক আগে লিখলুম—বাবা, পরীক্ষা আগতপ্রায়; আর এক মাসও নেই;

বুঝতেই পারছেন পড়ার চাপ ও চাড় বাড়ছে ; শুধু দুঃখ্যু এই —আমার স্বাস্থ্য ভেঙেছে—I am ill.

দু'সপ্তাহ পরে লিখলুম—বাবা, পরীক্ষা আর মাত্র পনেরো দিন পরে ; পড়ার মাত্রাও বাড়িয়েছি বাধ্য হয়ে : তবে স্বাস্থ্যটা আরও ভেঙেছে—I am iller.

পরীক্ষার আগের দিন লিখেছি—বাবা, কাল থেকে পরীক্ষা শুরু ; দিনরাত অবিরাম পড়ে চলেছি। কিন্তু এদিকে স্বাস্থ্যটা একেবারে ভেঙে চুরমার—I am illest.

এ অবস্থায় ছেলে পরীক্ষায় শেষ পর্যন্ত বসতে পারলেনা জেনে বাবা আশা করি অবুঝ হবেন না।

নাম-সঙ্কট

মেদিনীপুর কলেজে যখন অধ্যাপক হয়ে যোগ দিই, ফারসী পড়াতেন মৌলভী আমিনুল হক্, বি.এ.। সবাই মৌলভীসাহেব বলে ডাকতুম। লোকটি ভাল।

মৌলভীসাহেব বুঝলেন শুধু গ্র্যাজুয়েট হওয়ার জন্যে লেক্চারারের মর্যাদা ও বেতনের হার তিনি পাচ্ছেন না। তাই ফারসীতে পরীক্ষা দিয়ে এম্.এ. পাস-টা করে নিলেন। লেক্চারার হিসেবে স্বীকৃতি ও গ্রেড দাবী করলেন। দাবী মঞ্জুর হোলো ; না-মঞ্জুরের কোনও কারণ ছিলনা।

তারপর মৌলভীসাহেব আমাদের অনুরোধ জানালেন যে অন্য অধ্যাপকদের আমরা যেমন মিঃ মুখার্জী, মিঃ দত্ত, মিঃ ঘোষ ইত্যাদি বলে সম্বোধন করি, তেমনি এবার থেকে তাঁকে যেন মিঃ হক্ বলি। বয়স্ক প্রফেসররা তখনি বললেন—"নিশ্চয়! নিশ্চয়!" এবং তাঁকে মিঃ হক্ বলেই ডাকতে লাগলেন।

আমি বিষয়টা ততো খেয়াল করলুম না, এবং অভ্যাসমতো মৌলভীসাহেবই বলে চললুম। মৌলভীসাহেব মাঝে মাঝে অনুযোগ করেন : সবাই এখন আমায় মিঃ হক্ বলেন, তুমিই শুধু মৌলভীসাহেব বোলছো।

রগড় করার জন্যে আমি জিগেস্ করলুম—কেন, হঠাৎ কী হোলো যে তোমায় এখন মৌলভীসাহেব না বলে,

মিঃ হক্ বলতে হবে; তোমার কি আরও দুটো ঠ্যাং গজালো নাকি?

—কেন, আমি তো এখন এম্.এ. পাস করেছি, পুরোপুরি লেক্চারার হয়েছি।

—ওঃ, ইউনিভার্সিটী কি তোমার ডিগ্রীতে লিখে দিয়েছে যে ইনি এম্.এ. পাস করলেন, এবং এবার থেকে এঁকে মিস্টার বলতে হবে।

—সব লেক্চারার যদি মিস্টার তো, আমিই বা মিস্টার নই কেন?

—কে বললে সবাই মিস্টার—জ্ঞান শাস্ত্রীমশাইকে তো আমরা পণ্ডিতমশাই বলি; সংস্কৃত যিনি পড়ান তিনি পণ্ডিতমশাই, আর ফারসী যিনি পড়ান তিনি মৌলভীসাহেব; এই তো ঠিক।

মৌলভী বললেন—পণ্ডিতমশাই তো মাত্র বি.এ.।

যাক্, শেষমেষ আমি রাজি হোলুম তাঁকে মিস্টার বলে সম্বোধন করতে।

পরের দিন থেকেই তাঁকে মিঃ হগ্ (Hog) বলে ডাকতে শুরু করলুম। প্রথম তিন-চারদিন ঠিক ধরতে পারেননি। সেদিন যেই মিঃ হগ্ বলেছি, মৌলভীসাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন—কী! মিস্টার হগ্! মুসলমানের ছেলেকে শূয়োর বলছো! ফের যদি বলেছ, মহা অনর্থ করবো বলছি, বিনয়!

আমি বললুম: তোমাদের ঐ হকের 'ক্বাফ্' আমার জিবে ঠিক উচ্চারণ হয়না—তাই হগের মতো হয়তো শোনাচ্ছে।

মৌলভীসাহেবকে আমি মিস্টার হগ্ই বলে চলেছি। এমন সময় একদিন প্রিন্সিপাল আমার কাছে এসে, আমায় আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললেন: তোমার জ্বালায় আর পারা যায়না; ফাল্তু এ কী কাণ্ড বাধিয়ে বসেছ ছ্যাখো; আমিনুল হক্ জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটকে আমার মারফৎ এক দরখাস্ত দিয়েছে।

পকেট থেকে একটা কাগজ বার করলেন; পড়ে দেখি লিখেছে—

"একটি জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে বাধ্য হইতেছি। এই কলেজের একজন অধ্যাপক ও আমার একজন সহকর্মী—মিস্টার বিনয়জীবন ঘোষ—সর্বদা আমাকে মিঃ হগ্, অর্থাৎ শূয়ার বলিয়া সম্বোধন করে। একজন মুসলমানের প্রতি এইরূপ ব্যবহারের অর্থ তাহার ধর্মানুভূতির উপর রূঢ় আঘাত করা। সত্বর আমার প্রতি সুবিচারের ও এই অন্যায়ের প্রতিবিধান প্রার্থনা করি। দুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে ইহার আশু প্রতিকার না হইলে এই স্ফুলিঙ্গ হইতে শহরময় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বহ্নি ছড়াইয়া পড়িবে।"

প্রিন্সিপাল বললেন—আমি দরখাস্তটা চেপে রাখছি; ওরকম আর কোরোনা, আর ওকে গিয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করো।

আমি মৌলভীসাহেবের কাছে গিয়ে বললুম—তোমার মাথা কি খারাপ হোলো! নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা-হাসি নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত করেছ; তাও আগে আমায় কিছু জানালেনা।

—কী করবো বলো, তুমি তো কোন কথা শুনবেনা।

—আচ্ছা, এবার থেকে তোমায় মিঃ হগ্ আর বোলবোনা; মিঃ 'হুক্কা' বলেই ডাকবো।

—ঠিক কথা দিচ্ছ আর মিঃ হগ্ বলবেনা? আমি প্রিন্সিপালের কাছ থেকে দরখাস্তটা ফিরিয়ে নেবো। এখনও মিঃ হুক্কা বলছো তবু কিছুতেই মিঃ হক্ বলবেনা। যাকৃগে, তাই বোলো; তুমি incorrigible—শোধরাবার বাইরে।

—বিশেষ ধন্যবাদ, মিঃ হুক্কা-হুয়া।

মৌলভী হাসতে হাসতে বললেন: শূয়োর থেকে আমায় শেয়ালে নামিয়েছ। যাক্, এতেই আমি সন্তুষ্ট। তুমি একটা নচ্ছার!

ঐ একই রকম কাণ্ড ঘটেছিল, আর ঠিক একই মন্তব্য—"তুমি শোধরাবার বাইরে" শুনতে হয়েছিল বেশ ক'বছর বাদে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের সেক্রেটারির দপ্তরে তখন আমি নিম্নতম অফিসার। ইউরোপীয়ান দলের একজন বেতনভুক্ সেক্রেটারি ছিলেন। দূর থেকে তাঁকে দেখতুম। পোশাকে-আশাকে, কায়দা-কেতায় পূরো সাহেব, শুধু বিশেষরকম কৃষ্ণকান্ত। মুখে সর্বদা মোটা বর্মা-চুরোট। কাজে মাঝে মাঝে কর্পোরেশনে আসতেন, তবে বড় বড় অফিসারদের কাছে।

একদিন সন্ধ্যেবেলা তিনি আমার ঘরে ঢুকলেন; নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন—আমি ইউরোপীয়ান দলের সেক্রেটারি মিঃ আর. ঈ. গোম্‌স; একটা কাজে আপনার কাছে এসেছি।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর একটা কার্ড আমার হাতে দিলেন।

কার্ডখানা পড়তে পড়তে আমি বলে ফেললুম—ও বাবা! শুধু গো-তেই রক্ষে নেই; শুধু মেষ-এ রক্ষে নেই—আপনি দেখছি একাধারে গো-মেষ দুই-ই।

চম্‌কে উঠে তিনি বললেন—What! একী! আপনার সঙ্গে আমার কিছুমাত্র আলাপ নেই; আমরা পরস্পরের সম্পূর্ণ অপরিচিত; আপনি আমার নাম নিয়ে এইরকম কুশ্রী মন্তব্য করেন; আমি যাচ্ছি সেক্রেটারির কাছে নালিশ করতে।

আমি: খাম্‌কা চটছেন; আমি কোনও মন্তব্য করিনি। এই তো আপনি নিজে কার্ড দিয়েছেন; এতে লেখা রয়েছে দেখছি—আর. ঈ., জি আর ও—গো,—এম্, ঈ, এস্—মেষ—গো-মেষ।

গোম্‌স—আমার নামের ও-উচ্চারণ নয়; আমার নাম আর. ঈ. গোম্‌স।

আমি—সেকথা আপনি সেক্রেটারিকে জানাতে পারেন যে আমি আপনার নামের ভুল উচ্চারণ করেছি; ওটা এমন কিছু নতুন কথা নয়; আমার জিবে সাহেবী নামের ঠিক উচ্চারণ হয়না। অধিকাংশ ইউরোপীয় নাম আমি ভুল উচ্চারণ করি।

কট্‌মট্‌ করে খানিকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে, গোম্‌স হো-হো করে হেসে উঠলো। বললে—তুমি তো ভারি রগড়ের ছোকরা হে! এই প্রথম তোমার ঘরে ঢুকলুম, আর তুমি আমায় গো-মেষ বলে সম্বর্ধনা করলে!

আমি—স্বীকার করবে তো, সম্বর্ধনায় একটু মৌলিকত্ব আছে।

গোম্‌স—You are incorrigible—তুমি শোধরাবার বাইরে।

সেদিন থেকেই আমাদের দু'জনের মধ্যে মধুর হৃদ্যতা গড়ে উঠলো এবং তা বহু বছর বজায় ছিল। অবশ্য আমি তাকে বরাবরই 'গো-মেষ' বলে সম্বোধন করতুম। গোম্‌স সত্যি একটা ভাল লোক।

নাম-সঙ্কটের সবচেয়ে মজার ঘটনাটা এবার বলছি—

মফস্বলের শহর। অতিরিক্ত জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাশ। মোটর দুর্ঘটনা, বেপরোয়া মোটর চালনা—ইত্যাদি খুচরো মামলার বিচার চলছে। কাঠগড়ায় বছর বিশের একটি ছোকরা উঠলো।

হাকিম জিগেস্‌ করলেন—What's your name?—তোমার নাম কী?

আসামী—কানাইলাল মাল।

হাকিম—What's your father's name?—তোমার পিতার নাম কী?

আসামী—জন্‌ মাল অ্যাণ্ড কোং।

হাকিম (শশব্যস্ত হয়ে এবার বাংলায়)—আমি জিগেস্‌ করছি—তোমার পিতার নাম কী।

আসামী—জন্‌ মাল অ্যাণ্ড কোং।

হাকিম (চীৎকার করে)—তোমার বাবার নাম—বাবার নাম কী?

আসামী—জন্ মাল অ্যাণ্ড কোং।

হাকিম এবার কলম টেবিলের ওপোর ছুঁড়ে ফেলে হতাশভাবে চেয়ারে হেলান দিয়ে বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে ছোকরার দিকে চেয়ে রইলেন। সমস্ত আদালত-গৃহ নীরব, হতচকিত।

চারু মোক্তার উঠে—তিনিই কানাইলাল মালেদের বাঁধা মোক্তার—খেঁকিয়ে বললেন—হতভাগা! তোর বাবার নাম তো বরদাপ্রসাদ মাল।

আসামী—আজ্ঞে হ্যাঁ; বাবাকে লোকে বরদাপ্রসাদ মালও বলে।

হাকিম—এ-ই কি শহরের বড় ব্যবসাদার বরদাবাবুর ছেলে?

চারু মোক্তার—আজ্ঞে হ্যাঁ; ও বরদাবাবুর বড় ছেলে।

হাকিম—তুমি অপরের দোকানের ওপোর দিয়ে মোটর চালিয়েছ; তোমায় পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করলুম।

কাঠগড়া থেকে নামতে চারু মোক্তার কানাইলালকে গালাগালি শুরু করলেন—হতভাগা, গাধা, কাঠগড়ায় চড়ে এমনি ঘাবড়ে গেলি যে, নিজের বাপের নাম ভুলে গেলি; জন্ মাল অ্যাণ্ড কোং কখনও কারও বাপের নাম হয়?

কানাই উত্তর দিলে—বা রে, আমার কী দোষ! যখনই আপিসের চিঠির তলায় লিখি 'বরদাপ্রসাদ মাল'—বাবা বকাবকি করেন—কেটে দিয়ে 'জন্ মাল অ্যাণ্ড কোং' লিখে দেন। জিগেস্ করলে বলেন ওতে আইনের মার-প্যাঁচ আছে—তুই

বুঝবিনা। এ তো খোদ আদালত—আসল আইনের জায়গা। তাই বাবার নাম 'জন্ মাল অ্যাণ্ড কোং' বললুম।

চারু মোক্তার—তুই তাহলে বেশ ভেবেচিন্তে বাপের নাম 'জন্ মাল অ্যাণ্ড কোং' বললি।

কানাই—নিশ্চয়।

বিষ্ণু ডাক্তার বরদাবাবুর খুব বন্ধু। ঠাট্টা করে বললেন বরদাবাবুকে—এমনটি আর কারও হয়না; নিজের ছেলেই প্রকাশ্য আদালতে বলে আসছে 'অ্যাণ্ড কোং' তার বাবা।

বরদাবাবু ক্ষেপে উঠে শাসান—ঐ মুখ্যু কুলাঙ্গার ব্যাটাকে আমি ত্যাজ্যপুত্তুর করবো।

নির্বাচনে দাঁড়াই কেন ?

এ প্রশ্নের উত্তর সরল, সহজ, সর্বজনীন মনে হতে পারে। স্বাধীনতা-লাভের পূর্বে নির্বাচনে দাঁড়াতুম দেশমাতৃকার শৃঙ্খল-মোচনের আকুল আকূতি নিয়ে—বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন দুরন্ত সংগ্রামের দুর্জয় সঙ্কল্প সাধনের জন্যে। স্বাধীন ভারতে নির্বাচনে দাঁড়াই দেশের নব-রূপায়ণের রূপকার হওয়ার অদম্য অভিলাষ বুকে জাগে বলে—জনগণের দুঃখ-দুর্দশা মোচনের উদগ্র বাসনায় প্রজ্বলিত হয়ে, দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার পবিত্র প্রতিজ্ঞা নিয়ে, সেবাব্রতে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেওয়ার শপথ মেনে।

এর মধ্যে আর কী থাকতে পারে? কিন্তু আমার নজরে দু'একটা ঘটনা এসেছে যার মধ্যে কিছু বৈচিত্র্যের সন্ধান পেয়েছি।

আমার এক ডাক্তার ছাত্র প্রথমবার নির্বাচনে দাঁড়ালো। সাগ্রহে খবর রাখতুম কী রকম করছে। শুনলুম প্রাচীর-পত্র ও হ্যাণ্ডবিলে তার নির্বাচনী এলাকা ছয়লাপ করে ফেলেছে। কয়েকশ' পাড়ার ছেলেকে রোজ ভরপেট মণ্ডা-মেঠাই খাওয়াচ্ছে; তারা সারাদিন এবং রাতের খানিকটাও চেঁচিয়ে বেড়াচ্ছে ডাক্তার অমুক্‌কে ভোট দিন। বেশ চললো সরগরম। ভোটের ফলাফল বেরুতে দেখলুম তার ভাগ্যে ভোটের সংখ্যা

বড়ই বিরল। লোকেদের জিগেস্ করলুম কী ব্যাপার! তারা বললে ডাক্তারবাবু তো ভোট চাননা; ছোঁড়াগুলোকে খাওয়ালেন, আর খুব কাগজ ছাপালেন। নিজে মুখে কাউকে ভোট দেওয়ার জন্যে অনুরোধ জানালেন না।

ভাবলুম এ আবার কী!

যাক্, ঐ ডাক্তার ছাত্রটি আবাব আর একটি নির্বাচনে দাঁড়াতে, তাকে ডেকে পাঠালুম। এলোনা। কিছুদিন বাদে শুনলুম নির্বাচনের ঠিক আগে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছে।

তার প্রায় দু'সপ্তাহ পরে এক ভদ্রলোক এলেন। তিনি বললেন ঐ ডাক্তার ছাত্রের কাছ থেকে আসছেন। আমি ছাত্রকে ডেকেছিলুম; সে আসেনি; এতে হয়তো আমি মনে কিছু করেছি এই ভেবেই তাঁকে সব কথা আমায় খুলে বলার জন্যে পাঠিয়েছে। সে বুঝতেই পেরেছিলো যে নির্বাচন-সংক্রান্ত ব্যাপারেই আমি তাকে ডেকেছিলুম। কিন্তু 'স্যার'কে মিথ্যাকথা বলতে পারবেনা বলে সে আসেনি। সে কোনওবারই নির্বাচিত হওয়ার উদ্দেশ্যে নির্বাচনে দাঁড়ায়না। নির্বাচিত হলে তার পসারের ও আয়ের সমূহ ক্ষতি হবে। ডাক্তারদের নিজের বিষয়ে কোনও বিজ্ঞাপন দেওয়া নিষেধ। তাই সে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে ডাক্তার হিসেবে তার নাম জনসাধারণে জাহির করে। সব জিনিসটা জেনে ছাত্রের আচরণে আমি যেন দুঃখিত না হই।

কথাটা শুনে এদিকটায় মনে কৌতূহল জাগলো। আমার একজন অনুজতুল্য উকিল, যখন যে নির্বাচন হয়, যখন যেটা

যোগাড় করতে পারে যে-কোনও একটা দলের ছাপ নিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। আমায় এসে জানায় নির্বাচনে দাঁড়িয়েছি। আমার কাছে শুধু বকা-ঝকাই পায়—কোনও সাহায্য বা সমর্থন মোটেই না।

আমি বলি: কী পাগলামি করছিস্? তোর নির্বাচনে জেতার কিছুমাত্র আশা নেই।

মোটেই চটেনা, একটুও দমেনা; শুধু হেসে চলে যায়। যথাসময়ে নির্বাচনে হেরে ঢোল হয়।

তার বিষয়টা একটু খোঁজ নিতেই জানতে পারলুম নির্বাচনে সাফল্য তার মোটেই কাম্য নয়। কিন্তু সে হাতে-নাতে দেখেছে—এক-একটা নির্বাচনে নামছে ও হারছে—সঙ্গে সঙ্গে উকিল হিসেবে তার নাম ছড়াচ্ছে—মক্কেল বাড়ছে—পসার জমছে। তাই আমার কথা শুনে সে শুধু একটু মুচকে হাসে।

এতক্ষণ যা বললুম তা নির্বাচনে দাঁড়ানোর শাশ্বত উদ্দেশ্যের তালিকা-ভুক্ত। কিন্তু স্বাধীনতা-লাভের ঠিক পরেই যেসব নির্বাচন হয় তাতে নানারকম সাময়িক সুযোগ-সুবিধার মৌকা মিলতো।

মেদিনীপুরের এক ছাত্র এসে সহাস্যে জানালো—স্যার, আমি নির্বাচনে দাঁড়িয়েছি। কল্‌কাতার একটি নির্বাচন-কেন্দ্রের নাম করলে।

বল্‌লুম—হতভাগা, তোকে এখানে কে চেনে? কে ভোট দেবে? নিজের ভোটটা ছাড়া আর দ্বিতীয় ভোট পাবিনে।

—তা জানি।

—তবে দাঁড়ালি কেন ?

—শুনুন, স্যার, আমি যে-বাড়ীর দোতলায় থাকি তার একতলায় একজন ডাক্তার বসেন—তাঁর ডিস্‌পেন্‌সারিতে। ভদ্রলোক অনেকদিন থেকে একটা টেলিফোন পাওয়ার চেষ্টা করছেন। কোম্পানী বলছে কেব্‌ল্ (cable) যন্ত্রপাতি এখন মজুদ নেই ; এলেই তাঁকে টেলিফোন দেবে। কিন্তু সে যে কবে তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। ডাক্তার ভদ্রলোকই আমায় দাঁড়াতে বললেন। নির্বাচনে দাঁড়ালেই একটা টেলিফোন পাওয়া যাবে। ওঁর ডিস্‌পেন্‌সারিটাই আমার নির্বাচন-আপিস বলে ঠিকানা দিতে বলেছেন। একবার টেলিফোন বসে গেলে আর তোলে কে ! নির্বাচনের পর ডাক্তারবাবু ফোনটা নিজের নামেই করে নেবেন। জমা দেওয়ার আড়াইশ' টাকা—যা নির্ঘাত বাজেয়াপ্ত হবে—তাও ডাক্তারবাবুই দিয়েছেন। আমার লাভের মধ্যে—যতদিন ঐ বাড়ীতে আছি, ডাক্তারের ফী, এমনকি ওষুধের দামটাও দিতে হবেনা। ঠিক করিনি, স্যার ?

বললুম—বেশ করেছিস্ ; চুলোয় যা।

আর এক ভদ্রলোক, দীনুবাবু, দেখি কল্‌কাতা শহরে যেখানে যা নির্বাচন-উপনির্বাচন হচ্ছে সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ছেন। এমনকি একজন ভারত-বরেণ্য নেতার বিরুদ্ধেও তিনি নির্বাচন-দ্বন্দ্বে নেমে পড়লেন। ভোট কোনওবারই দশটির বেশী পাচ্ছেন না। জমানত জব্দ হচ্ছে প্রতিবার। যা সকলের মনে অবধারিত ছিল তাই ঘটছে। যাঁরাই

দীনুবাবুকে জানেন সবাই ব্যাপারটায় বিস্মিত ও কৌতূহলাবিষ্ট। কিন্তু বারবার গো-হারা হেরেও দীনুবাবুর উৎসাহ ও অধ্যবসায়ে একটুও ভাঁটা পড়ছেনা। ব্যাপারখানা কী!

আমার সঙ্গে দীনুবাবুর তেমন আলাপ-পরিচয় ছিলনা। দীনুবাবুর এক পুরোনো অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে প্রসঙ্গটা এসে গেল। বিষয়টা আসলে কী জানবার একটা প্রবল ঔৎসুক্য জেগে উঠলো দীনুবাবুর সেই বন্ধুর। বললেন— কোনও মতলব ছাড়া চলার পাত্র নয় দীনু। যে করেই হোক্, এর রহস্য-ভেদ আমায় করতেই হবে।

নিজের প্রকাণ্ড ক্রাইস্লার হাঁকিয়ে তখুনি চললেন দীনুবাবুর ওখানে।

আমায় মোটরে বসিয়ে রেখে বাড়ীর ভিতরে গেলেন। ঘণ্টাখানেক বাদে ফিরে তাঁর আবিষ্কার আমায় শোনালেন।

কিছুতেই রহস্য ফাঁস করতে রাজি হচ্ছিলেন না দীনুবাবু। শেষে অনেক সাধ্য-সাধনার পর প্রিয় বন্ধুর কাছে গুপ্ত তত্ত্ব প্রকাশ করলেন এই সর্তে যে, আর কারও কাছে যেন একথা প্রকাশ না হয়। তখন পেট্রলের খুব কড়া রেশন চলেছে। অথচ চোরা-কারবারে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিকাদারির দৌলতে কিছু লোক রাতারাতি মোটা টাকা কামিয়ে মোটর হাঁকিয়ে বেড়ানোর জন্যে উদ্‌গ্রীব। সুতরাং পেট্রল খুব চড়া দরে 'ব্ল্যাকে' বিক্রী হচ্ছে। নির্বাচনে দাঁড়ালেই প্রতি প্রার্থী আড়াইশ' গ্যালন পেট্রলের পারমিট্ পেয়ে যান। দীনুবাবু খতিয়ে দেখেছেন তাঁর আড়াইশ' টাকা জমানত বাজেয়াপ্ত

হয়েও আড়াইশ' গ্যালন পেট্রল ব্ল্যাকে বিক্রী করে প্রতি নির্বাচনে নীট মুনাফা দাঁড়ায় হাজার-বারোশ' টাকা। অবশ্য প্রাচীর-পত্র; হ্যাণ্ডবিল, ভলান্টিয়ার-ভোজনে বাজে খরচ তিনি একটি পয়সাও করেন না। স্রেফ্ মনোনয়ন-পত্রটি দাখিল করে চুপ করে নিজের ঘরে বসে থাকেন। লোককে বলেন, তিনি পরীক্ষা করে দেখছেন ভারতে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ কী দাঁড়াবে। লোকে, না-বলাতে, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে তাঁর মতো অতি উপযুক্ত ও যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দেয় কিনা তাই তিনি লক্ষ্য করছেন। Democracy in India is on its trial.

পণ্ডিত জ্ঞান শাস্ত্রী

মেদিনীপুর কলেজে সংস্কৃত ও বাংলা পড়াতেন পণ্ডিত জ্ঞান শাস্ত্রী। গাঁট্টা-গোঁট্টা, টেকো-মাথা, শ্যামবর্ণ, বেঁটে-খাটো লোকটি। নস্যি নিয়ে নিয়ে, ভারি ভরাট গলাতেও একটু নাকী সুর বাজে ; স্বর খন্‌খনে বাজখাঁই।

তাঁর কাছে পড়েছি, তাঁর সঙ্গে পড়িয়েছি। জ্ঞান পণ্ডিত বলতেন—তোর বাবাও আমার ছাত্র ; এটা তাঁর স্বভাবসুলভ অতিশয়োক্তি। বড়জোর কাকাবাবুকে হয়তো পড়িয়েছেন। পণ্ডিতমশাই যে আমার ঠাকুর্দাকেও তাঁর ছাত্র বলে দাবী করেননি সেটাই তাঁর পক্ষে সংযমের পরাকাষ্ঠা।

জ্ঞান শাস্ত্রীর কথা বলা মানে অজস্র কাহিনীর মালা গেঁথে যাওয়া। কিন্তু কী এক বিশেষ প্রতিভা ছিল পণ্ডিতমশাই-এর যার প্রভাবে প্রতিটি গল্প ভুলেও সম্ভাব্যের সীমানার পাশ ঘেঁষেও যেতোনা। যা একান্ত অসম্ভব তাই ঘটছে অহরহ তাঁর চোখের সামনে। তিনি সর্বদাই চলছেন, ফিরছেন, নিশ্বাস নিচ্ছেন সম্ভবাতীতের কল্পলোকে।

নিঃসন্তান জ্ঞান শাস্ত্রীর জীবন-সঙ্গিনী জীবনের মাঝপথেই তাঁকে ছেড়ে বৈকুণ্ঠে গেলেন। পণ্ডিতের নিঃসঙ্গ জীবন কাটতো কলেজের হস্টেলে। ছুটী হ'লে ছুটতেন কাশীতে। একটা ছোট বাড়ী কিনেছিলেন সেখানে।

এক রায়বাহাদুর বড় উকিলের ছেলেকে স্কুলের সংস্কৃত শেখাতে জ্ঞান শাস্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন গৃহ-শিক্ষক। কলেজের গ্রীষ্মের বন্ধের অবকাশ স্কুলের চেয়ে ঢের বেশী। কলেজ বন্ধ হতেই পণ্ডিতজী গেছলেন কাশীতে। স্কুল খুলে যাওয়ার পরও কিছুদিন পড়াতে এলেন না। কলেজ খুলতে কাশী থেকে ফিরলেন।

পণ্ডিত না আসাতে রায়বাহাদুর বিরক্ত। প্রথম যেদিন পড়াতে গেলেন, রায়বাহাদুর জিগেস্ করলেন—পণ্ডিতমশাই, এতদিন ছিলেন কোথায়?

জ্ঞান শাস্ত্রী উত্তর দিলেন—কাশীতে।

এখানে পরস্পর ভুল বোঝা-বুঝির একটা প্রহসন ঘটে গেল। কাশীতে পণ্ডিতের বাড়ী কেনা, এবং সেখানে তাঁর প্রায়ই যাওয়ার বিষয় রায়বাহাদুর কিছুই জানতেন না। তিনি ভাবলেন অন্য দশজনের মতন জ্ঞান পণ্ডিত এবার কাশী-ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। অথচ জ্ঞান পণ্ডিতের হয়তো এই নিয়ে বিশবার বারাণসী-গমন।

রায়বাহাদুর প্রশ্ন করলেন: কাশীতে দেখবার মতো জিনিস কী দেখলেন।

আশা করেছিলেন বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণার মন্দির, দশাশ্বমেধ, মণি-কর্ণিকার উল্লেখ শুনবেন।

জ্ঞান শাস্ত্রী মাথা নীচু করে একটু ভেবে বললেন—এবার কাশীতে দ্রষ্টব্য তেমন আর কি চোখে পড়লো; ঐ শুধু একদিন বৃষ্টি পড়েছিল; এক একটা বৃষ্টির ফোঁটা এত বড়!

(দু'হাত দিয়ে গরুর গাড়ীর চাকার আকারের একটি বৃত্ত রচনা করে দেখালেন।)

বলেই, ছাত্রের ঘরে চলে গেলেন পড়াতে। বুড়ো ঘাগী উকিল রায়বাহাদুর অবাক হয়ে ভাবতে বসলেন—এক একটা বৃষ্টির ফোঁটা এক একটা গরুর গাড়ীর চাকার মতো বড়! এমন তো কখনও দেখেননি, কারুর মুখে শোনেনওনি ; পণ্ডিতটা বলে কী!

জ্ঞান শাস্ত্রী পড়িয়ে চলে গেলে, ছেলেকে ডেকে রায়-বাহাদুর জিগেস্ করলেনঃ হ্যাঁরে রণ্টু, তোর ঐ পণ্ডিত লোক কেমন?

রণ্টু বললে—কেন?

রায়বাহাদুর বৃষ্টির ফোঁটার আয়তনের কথাটা বললেন।

রণ্টু হেসে জানালেঃ পণ্ডিতমশাই তো অনবরত ঐ ধরনের আজগুবি গল্প বলেন।

হাঁফ ছেড়ে রায়বাহাদুর মন্তব্য করলেন—তাই বল্, হতভাগা পণ্ডিত আমার মাথাটা একেবারে ঘুলিয়ে দিয়েছিল।

পণ্ডিতমশাই আমাদের ক্লাসে বাংলা পড়াতে পড়াতে গল্প বললেন—

সেনেটের সভাটা ভাঙতে সেদিন একটু দেরী হোলো; ফেরার ট্রেন ধরতে হবে; হাতে সময় বেশী নেই। হন্‌হন্ করে চলেছি—হ্যারিসন রোড (এখন মহাত্মা গান্ধী রোড) ধরে। হঠাৎ দেখি এক-সের জল-ভরা বড় ডাবের মতো

একটা মাথা—ছ'পায়ের ওপোর গড়াচ্ছে। জিগেস্ করলুম—কে রে ?

—শাস্ত্রীজী, আমি আশু ; না বলেই চলে এলেন ; পায়ের ধুলো নেওয়া হয়নি ; এ পথ দিয়েই হেঁটে হাওড়া যাচ্ছেন খবর পেয়ে গাড়ী চড়ে খুঁজতে খুঁজতে আসছি।

বহু ছাত্রই একসঙ্গে প্রশ্ন করলুম : আশু কে, স্যার ?

পণ্ডিতমশাই—তোদের স্যার আশুতোষ।

শুধু বয়সের দিক থেকেই স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় জ্ঞান শাস্ত্রীর চেয়ে অন্ততঃ দশ বছরের বড়।

পণ্ডিতমশাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট, কি সেনেটের সদস্য হওয়ার এক মাইলের মধ্যেও কখনও আসেননি। কিন্তু তাঁর আলাপ-আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে আভাস-ইঙ্গিত যেন তিনি প্রায়ই সিণ্ডিকেট-সেনেটের সভায় উপস্থিত থাকছেন ; প্রস্তাব রচনা করছেন ; প্রস্তাব পেশ করছেন ; সবাই যখন কোনও দুরূহ জটিল সমস্যা বুঝে উঠতে পাচ্ছেন না তখন উনি দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে প্রাঞ্জল, সরল করে দিচ্ছেন—ইত্যাদি।

মাত্র একবারই তাঁর নিজের মুদ্রায় তাঁকে শোধ দিতে পেরেছিলুম। আমরা ক'জনে বিশ্রাম-কামরায় বসে গল্প করছি, এমন সময় জ্ঞান পণ্ডিত এলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি লাইব্রেরিয়ানকে বললুম—কাল পণ্ডিতমশাই-এর যে চিঠিখানা এয়েছে সেটা ওঁকে দিয়েছেন ?

লাইব্রেরিয়ান আমতা আমতা করছেন—কোন্ চিঠি ?

আমি পণ্ডিতমশাইকে বললুম : সে-চিঠিতে যা আছে তা তো আপনি অনেক আগেই জানেন।

পণ্ডিত—কী আছে চিঠিতে ?

আমি—স্যার সি. ভি. রমন এবছর বিজ্ঞান-কংগ্রেসের সভাপতি হতে সম্মত হন্নি। তাই ওঁরা আপনাকেই সভাপতি স্থির করেছেন।

সকলে হো-হো করে হেসে উঠলেন।

জ্ঞান পণ্ডিত ক্রোধে গর্জে উঠলেন : লাঠি দিয়ে ও-ছোঁড়াটার মাথা যদি ছাতু না করি আমার নাম জ্ঞান শাস্ত্রী নয়।

দু'একজন ইশারা করতে আমি সেখান থেকে সরে পড়লুম, এবং কিছুদিন পণ্ডিতমশাইকে এড়িয়ে চললুম।

মেদিনীপুর আর খড়্গপুরের মধ্যে একটা ছোট স্টেশন আছে, নাম গোকুলপুর। গোকুলপুরে থাকার মধ্যে আছে দু'তিনখানা ভাঙা, খড়-ওঠা, মাটির কুঁড়ে ; একটা ছোট্ট, ময়লা, পানা-ঢাকা ডোবা ; সরু শুকনো কয়েকগাছা বাঁশের একটা ঝাড়, গোটা দুই বাব্‌লা আর গোটা দুই অশথ গাছ। বাকি খাঁ খাঁ করছে রুক্ষ মাঠ। গোকুলপুর সম্পর্কে 'প্রাকৃতিক শোভা' কথা দুটো ব্যবহার করলেই যারা জায়গাটা চেনে তাদের মুখে অজ্ঞাতেই ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠবে। গোকুলপুরের প্রাকৃতিক দৃশ্য নয়নাভিরাম তো নয়ই, বরং চক্ষুর অত্যন্ত পীড়াদায়ক। এই সঙ্গে আর একটা কথা মনে রাখতে হবে, ঐ লাইনটা দিয়ে

য'খানা ট্রেন চলে তার মধ্যে গোমো-প্যাসেঞ্জারখানা শুধু প্যাসেঞ্জারই নয়, একেবারে নড়বড়ে ঝড়ঝড়ে গাধা-বোট।

জ্ঞান পণ্ডিত আমাদের বাংলা পড়াচ্ছেন। বললেন—

গ্যাখ্, নৈসর্গিক শোভা তোর আমার চোখে ধরা দেয়না; কবির চোখই খুঁজে পায় প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণ-ছন্দ। এই গ্যাখ্‌না গতবছরের ঘটনাটা। গোমো-প্যাসেঞ্জারে কল্‌কাতা থেকে ফিরছি। ট্রেনটা গোকুলপুরে দাঁড়ালো তো দাঁড়ালোই। এক ঘণ্টা আট্‌কে থাকার পর রেগে প্লাটফর্মে নামলুম ব্যাপারখানা কী জানতে। যেই চেঁচিয়ে জিগেস্ করেছি—"কী হোলো, মশাই", চারদিক থেকে ঠোঁটের ওপোর আঙুল চেপে লোকেরা আমায় চুপ করতে ইশারা করলে। হাত বাড়িয়ে একটা দিকে দেখালে। দেখি সেখানে একটা লোক দাঁড়িয়ে। কিন্তু একটু চাইতেই আমার চোখ দুটো ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসবার দাখিল! সেই লোকটিকে দেখে। বল্ দেখি তোরা, সে কে?

একটু থেমে, জ্ঞান শাস্ত্রী নিজেই বলে চললেন—আর কেউ নন, স্বয়ং মহাকবি রবীন্দ্রনাথ। একটা বাব্‌লা-গাছের তলায় দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে অপলক দৃষ্টিতে পানা-ভরা ডোবাটার দিকে চেয়ে। প্লাটফর্মে সবাই পরস্পরকে সাবধান করে দিচ্ছে—কবির ধ্যান ভাঙাবেন না।

আমরা সবাই চীৎকার করে উঠলুম: গোকুলপুরে রবিঠাকুর; কী যে বলেন, স্যার?

—আরে, ঐ তো বললুম, তোর আমার চোখে গোকুলপুর

একটা নেড়ী বুড়ীর মাথার মতো। কিন্তু কবিগুরুর মুগ্ধ দু'নয়ন সন্ধান পেলে গোকুলপুরেই অফুরন্ত সুষমার, অনন্ত সৌন্দর্যের।

বর্শা-ফলকের মতো তীক্ষ্ণাগ্র, হুল-ফোটানো ব্যঙ্গ-উপহাসেও জ্ঞান শাস্ত্রী কম পটু ছিলেন না।

মৃগাঙ্ক বরাবর আমাদের এক ক্লাস ওপোরে পড়তো। আই.এ.-তে বেচারা ফেল্ করলে। বাধ্য হয়ে লজ্জা ও দুঃখে ম্রিয়মাণ মৃগাঙ্ক দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে আমাদের সঙ্গেই পড়তে এলো। সেদিনই এসেছে প্রথম। জ্ঞান শাস্ত্রী জিগেস্' করে বসলেন—মৃগাঙ্ক, কোন্ কোন্ বিষয়ে ফেল্ হ'লে?

মৃগাঙ্ক—শুধু ইংরেজীতে।

পণ্ডিত—ক'নম্বরে?

মৃগাঙ্ক—মাত্র একনম্বরে।

পণ্ডিত—ত্রিশ বছর মাস্টারি করছি। আজ পর্যন্ত এক বিষয় ছাড়া দু'বিষয়ে কোনও ছাত্রকে ফেল্ করতে শুনলুম না। তাও শুধু একনম্বর ছাড়া, দু'নম্বরে কেউ ফেল্ করেনা। তবে কি জানো, মৃগাঙ্ক, ঐ এক বিষয়ে একনম্বর তুলতেই অনেককে চার-পাঁচবার পরীক্ষা দিতে দেখি।

ঘুষি পাকিয়ে উত্তেজিতভাবে দাঁড়িয়ে উঠে মৃগাঙ্ক বললে—ভাল হবেনা বলছি, স্যার।

পণ্ডিত—চটে উঠলেই পরীক্ষায় নম্বর ওঠেনা।

প্রফেসর রণদা বাপের এক ছেলে। নতুন বিয়ে করেছে।

নতুন অধ্যাপক হয়েছে। সাহেবী পোশাকের ভক্ত। ভাল ছাঁট-কাটের দামী স্যুট বানাচ্ছে। সবাই তার সাজের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মনে-মনে রণদা তাই চায়। একটা নতুন নীল ব্লেজারের দামী স্যুট পরে এসে জ্ঞান পণ্ডিতের সুমুখে দাঁড়িয়ে জিগেস্ করলে পোশাকটা কেমন দেখাচ্ছে।

শাস্ত্রীজী তৎক্ষণাৎ জবাব করলেন—এটা তৈরী করে খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছ। এই কোট-প্যাণ্টগুলো তো ডাঁই ডাঁই নীলেম হয় চাঁদপাল ঘাট, আউটরাম ঘাটের সুমুখে—এক একটা আট আঁনা, বড়জোর একটাকা।

রণদার মুখ রেগে লাল ; চেঁচিয়ে উঠলো—কী আবোল-তাবোল পাগলের মতো বকছেন।

জ্ঞান শাস্ত্রী—চট্ছো কেন ? ব্যাপারটা আমি না-হয় জানি। অন্যেরা ধরতে পারবেনা। একেবারে নতুনের মতো। রং করিয়ে নিয়েছে তো ; বেশ করেছে ; ওগুলো কেনা, কাচানো, নতুন-রং-করা সব নিয়ে দশটাকায় একটা স্যুট হয়ে যায়। তোমার মতো অনেকেই এইরকম করে।

রণদা—কী প্রলাপ বকছেন ?

জ্ঞান শাস্ত্রী—আরে, আমি ও-জিনিসটা অনেককালই জানি। নাবিকদের ছ'মাস অন্তর তিনটে করে নতুন স্যুট দেয়। তারা নতুন স্যুট পেলেই ডাঙায় নেমে জলের দরে পুরোনো স্যুটগুলো বিক্রী করে দেয়। তারপর সেগুলো নীলেম হয়। তুমিও তো সেই নীলেমেই এটা কিনেছ ?

রণদা—ইডিয়ট্ কোথাকার ! আমি ঐ সেলারদের পুরোনো

স্যুট পরবো ? আড়াইশ' টাকা দিয়ে সাহেববাড়ী থেকে নতুন স্যুট বানালাম, আর এই আহাম্মক যা-তা বকতে শুরু করলে। টুলো পণ্ডিতটাকে জিগেস্ করাই ভুল হয়েছে।

আমরা সকলে রণদাকে নিরস্ত করলুম। প্রতিবাদ জানিয়ে বললুম—একটা অতি উপভোগ্য তামাসা সহ্য করতে না পেরে তার অশালীন ভাষা ব্যবহার অতিশয় নিন্দনীয়।

জোর করে রণদাকে বাড়ী পাঠানো হোলো. নইলে সেদিন একটা বিষম অনর্থ বাধতো।

MOON-BATH (শশী-স্নান)

শীতপ্রধান দেশে মহিলাদের মধ্যে বিশেষ করে Sun-bath—সূর্য-স্নান এখন একটা খুব চালু্ ফ্যাসান। রমণীর পেলব মসৃণ ত্বক্ ও দেহের লাবণ্য রক্ষা ও বৃদ্ধির পক্ষে এ নাকি অপরিহার্য হয়ে উঠেছে সেসব দেশে। আমাদের সূর্য-তাপ-দগ্ধ ভারতে সূর্য-স্নান অনেকক্ষেত্রে অপঘাত মৃত্যুর কারণ। এখানে একটি Moon-bath—শশী-স্নানের কাহিনী লিখছি। আর যেহেতু Sun-bath—সূর্য-স্নান নারীদের প্রিয়, স্বাভাবিক নিয়মে এই Moon-bath—শশী-স্নানের নায়ক একজন নর।

জন আটেক স্কটীশ চার্চ কলেজের ছাত্র দল বেঁধে এসে শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট মেসে পাশাপাশি তিন-চারটে ঘর দখল করলুম ; ক্লাস সেই শুরু হচ্ছে ; বই তখনও একখানাও কেনেনি কেউ ; কাজ স্রেফ্ নরক গুলজার করা।

আমরা দোতলায় থাকি ; এক ফ্যাসাদ। ‘ছোট বাইরে’ নয় তেতলায়, নয় একতলায় ; ‘বড় বাইরে’ শুধু একতলায়। তেতলায় একসার ঘর—তার কোলে উঁচু পাঁচিল ঘেরা ছাদ। মাঝখান বরাবর একপাশে একটা জলের মস্ত ট্যাঙ্ক—তারই আড়ালে একটা ‘ছোট বাইরে’র জায়গা।

হঠাৎ একদিন রাত দুটোর সময় সৌমেন খড়ম-সুদ্ধু সিঁড়িতে গড়াতে গড়াতে হুড়মুড় করে দোতলার বারান্দায়

পড়ে গোঙাতে চেঁচাতে আরম্ভ করলে—তোরা সব ওঠ্ ওঠ্—ভূত—তেতলার ছাদে ভূত—আমি নিজে চোখে দেখেছি—পড়ে হাড়গোড় ভেঙে গেছে।

চেঁচানিতে ঘুম ভাঙতেই একলাফে আমরা পাঁচ-ছ'জন বারান্দায় উপস্থিত হোলুম। সৌমেন নিজে থেকে উঠতে পারছেনা—চ্যাং-দোলা করে তাকে বিছানায় শোয়ানো হোলো। সৌমেন বললে, ছাদে পৌঁছে দেখলে জ্যোৎস্না ফিন্‌কি দিচ্ছে,—হঠাৎ চোখ পড়লো ও-কোণের দেওয়ালের ছায়া-ঢাকা আবছা জায়গাটায়। স্পষ্ট একটা ছায়ামূর্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার দেখতে এতটুকু ভুল হয়নি। এতদিনে জীবনে প্রথম স্বচক্ষে ভূত দেখলে।

আমরা সবাই তাকে আক্রমণ করলুমঃ বুড়োধাড়ি ভূত দেখলে; আর তাও জ্যোৎস্না-রাতে, এবং পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট মেসে যেখানে পঞ্চাশটা জ্যান্ত মাম্‌দো ভূতের বাস।

সৌমেন বললেঃ তোরা বিশ্বাস কর্ আর চাই না-কর্; আমি নিজে চোখে ভূত দেখেছি; ভয়ে পালিয়ে আসতে গিয়ে প্রাণটাই প্রায় খুইয়েছিলুম।

সৌমেনের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা বুঝে, আমরা দু'তিনজন ঠিক করলুম তেতলার ছাদে গিয়ে দেখে আসা যাক্।

ছাদে যাকে বলে কাক-জ্যোৎস্না; হঠাৎ আমাদের মুখ শুকিয়ে গেল; ঠিকই তো ও-কোণটায়—পাঁচিলের ছায়া আর জ্যোৎস্নার আলো যেখানে মিশেছে—একটা আবছা মূর্তি নড়ে বেড়াচ্ছে। ভয়ে আমরা কাঠ; দু'তিনজন একসঙ্গে না থাকলে, সৌমেনের মতো আমরাও ছুটে পালাতুম।

আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময়ে অশরীরীর কণ্ঠে বাণী শোনা গেল : ও কিছু নয়; আমি একটু বেড়াচ্ছি; আপনারা শুয়ে পড়ুন গিয়ে; জ্যোৎস্না-রাতে আমার একটু পুলক জাগে।

এতক্ষণে ভরসা পেয়ে একটু এগিয়ে দেখা গেল—কথা বলছেন চন্দ্রকান্তবাবু। ষষ্ঠ-বার্ষিক শ্রেণীর ইংরেজীর ছাত্র। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ভিতর অতি উচ্চ স্থান অধিকার করেছিলেন। বাংলা কবিতা লেখায় খুব ভালো হাত ছিল। অভিনেতা ও অভিনয়ের সমঝদার হিসেবেও তাঁর নাম ছিল। দুধের মতো ফরসা তাঁর গায়ের রং; অতিসুন্দর সুঠাম দেহ।

.সৌমেন ও আমাদের তাঁকে ছায়ামূর্তি বলে ভ্রম করার কারণ—সেসময়ে তাঁর সর্বাঙ্গে একটি সূতোও ছিলনা—তখন তিনি কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি উর্বশী (পুং)।

ডাক্তারবাবুর প্রত্যাবর্তন

বয়স যখন তাঁর বিশ, জীবিকা হিসেবে বেছে নিলেন চিকিৎসকের পেশা। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বসু যখন শুরু করেন ডাক্তারি, তখন পাস না করে ডাক্তার, আইন না পড়ে উকিল হওয়া চলতো।

হাতযশ কিছুটা, কিছুটা নিশ্চয় তাঁর নিজের বিজ্ঞতা, খানিকটা স্বীয় চেষ্টায় জ্ঞানার্জনের কারণ বিশ্বেশ্বরবাবু কিছুদিনের মধ্যেই শহরের সেরা ডাক্তার হয়ে উঠলেন। মফস্বলের জেলা-শহর, কতই বা বসতি। তবু শহরের জনসংখ্যা বেড়ে চললো, সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বেশ্বরবাবুর পসারও। ডাক্তার বলতে বিশ্বেশ্বর ডাক্তার। সবাই তাঁকেই ডাকে।

দীর্ঘ ষাটবছর চললো ডাক্তারি। বিরাট বাসভবন গড়ে উঠলো—শহরের বিভিন্ন পল্লীতে আরও দশখানা ছোট, মাঝারি বাড়ী—ভাড়া খাটার জন্যে। গাড়ী হোলো, বিস্তীর্ণ জমিদারি, কল্‌কাতাতেও একখানা বাড়ী, ব্যাঙ্কে দু'এক লাখ টাকা।

আশিবছর পূর্ণ হতে অবসর গ্রহণ করলেন শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বসু নিজের পেশা থেকে। কী মুক্তি! কী স্বস্তি! কী অবকাশ! কী আরাম! ষাটটা বছর কেটেছে তিনটে জিনিসের অবিরাম ঘূর্ণিচক্রে—রোগী, ওষুধ, টাকা—টাকা, ওষুধ, রোগী। নিশ্বেস ফেলার সময় নেই; খাবার ঠিক নেই;

ঘুমোবার জো নেই। নিজের ছেলেমেয়ে মোটমাট ক'টা হোলো ; ক'টা মরে গেল ; তারা কী হোলো—বাঁদর, না ভূত, না মানুষ—কিছুই দেখার বোঝার অবসর করে উঠতে পারেননি। তবু জোর বরাতের লোক ডাক্তার বিশ্বেশ্বর বসু ; ছেলে ক'টা—সংখ্যায় বেশ—সবাই মানুষ হয়েছে। মেয়েগুলোর—তাও সংখ্যায় কম নয়—বিয়ের পর জামাই ক'টাও উৎরে গেছে ভালই।

এরই মধ্যে বিখ্যাত চিকিৎসকের দু'একটা ছেলেমেয়ে মারা গেছে বিনা-চিকিৎসায়। ফী-দাতা বাইরের রোগীর ভিড় ঠেলে বিনা-ফীর বাড়ীর ভিতরের রোগীর দিকে চোখ ফেরাবার ফুরসৎ পাননি ডাক্তার বিশ্বেশ্বর বসু। এখন তিনিই একটা নাতির মাথায় বাবরি-কাটা টেড়ি দেখে, রেগে নাপিত ডাকিয়ে চুল নেড়ার মতো ছোট ছোট করে কাটিয়ে দিচ্ছেন ; মেজ ছেলের বড় খোকাটার মুখে যেন সিগারেটের গন্ধ পেলেন ; মেজ বৌমাকে ডেকে শাসিয়ে দিলেন যেন ছেলেটার হাতে একটা পয়সাও না দেন।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বসুর জীবনের লয় দীর্ঘ। বারো বছর কেটে গেল ডাক্তারি থেকে বিদায় নেওয়ার পর। অবসর হয়ে এল অবসাদ, স্বস্তি হোলো শাস্তি, আরাম হোলো হারাম। পুষ্পকরথের চাকার আওয়াজ শোনা গেলনা। ভাবলেন উপরের আপিসের কাজের গাফিলতিতে—তাঁর নামের ফাইলটা কোথাও চাপা পড়ে গেছে। শেষের দিনের প্রতীক্ষায় দিনের পর দিন এমনি করে আর কতদিন কাটানো যায়।

বিরানব্বুই বয়সে শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বসু হুকুম দিলেন বড়-ছেলে ভীমবাবুকে—আবার ডিস্পেন্সারি সাজাও, কম্পাউণ্ডার বাহাল করো, শহরে প্রচার করে দাও—আমি আবার ডাক্তারি আরম্ভ করলুম।

এ তো বাহাত্তুরে নয়, এ একেবারে বিরেনব্বুয়ে ব্যাপার! তবু বাড়ীঘর সম্পত্তি সবেরই মালিক যে তার কথা অমান্য করা চলেনা। যেমন হুকুম সব তেমনিই হোলো। সকালে আটটা থেকে দশটা, বিকেলে পাঁচটা থেকে সাতটা দৈনিক ডাক্তার-খানায় বসতে লাগলেন ডাক্তার বিশ্বেশ্বর বসু।

মাণিক আর আমি তখন কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি। মাণিক আমার বিশেষ বন্ধু। একদিন সকালে এসে সে আমায় বললে—তোকে আমার সঙ্গে যেতে হবে ডাক্তারের কাছে। প্রায় হপ্তাখানেক তার মা জ্বর, সর্দিকাশিতে ভুগছেন। কী মুশকিলেই পড়েছি—মাণিক বললে। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বসু বিরানব্বুই বয়সে ডাক্তারিতে প্রত্যাবর্তন করেছেন। তিনি বিশ, ত্রিশ, পঞ্চাশ বছর আগে মায়েদের ডাক্তার ছিলেন। মা তাঁকে দিয়েই চিকিৎসা করাবেন। এর আগে দু'তিনদিন গেছি বিশ্বেশ্বর ডাক্তারের কাছে ওষুধ আনতে; সে যে কী ঝকমারি তুই নিজে চোখে না দেখলে বুঝতে পারবিনা। মার সে-ওষুধে অসুখও সারছেনা। কিন্তু কিছুতেই আমার কোনও কথা শুনবেন না। তোকে আজ সঙ্গে নিয়ে যাই; তুই সব দেখে এসে মাকে বললে তবে যদি তিনি মত বদলান।

রওনা হোলুম ডাক্তার বিশ্বেশ্বর বসুর বাড়ী দু'জনে। সদর

গেট পার হয়ে একটু এগিয়ে একটা মস্ত হল্-ঘরে ঢুকলুম। একটা প্রকাণ্ড গোল চেয়ারে বড় একখানা টেবিলের ওধারে বসে আছেন্ ডাক্তার বিশ্বেশ্বর বসু। কালো কষ্টিপাথরে কোঁদা বিরাট বপু; মাথা একেবারে নেড়া; সাদা ধব্‌ধবে একজোড়া গোঁফ; ঠিক যেন একটি কেঁদো বাঘ বসে আছেন।

টেবিলের এধারে একটি বেঞ্চে আমরা দু'জনে বসলুম। একটু পরে ডাক্তারবাবু কট্‌মট্ করে আমাদের দিকে ভুরু কুঁচকে চাইলেন।

মাণিক উঠে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে চেঁচাতে শুরু করলে—আমি প্রিয়বাবুর মেয়ে উর্মিলাসুন্দরীর ছেলে; মার সর্দিকাশি জ্বর হয়েছে; পরশু আপনার কাছে ওষুধ নিয়ে গেছলুম।

ভ্রূকুটী সহকারে ডাক্তারবাবু জিগেস্ করলেন—জ্বর এখন?

—জ্বর আছে; একশ'র দু'পয়েণ্ট বেশী।

—সর্দিকাশি?

—সর্দি উঠছে না; বুকে বসে আছে; কাশি মাঝে মাঝে হচ্ছে।

হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন ডাক্তার—হতভাগা! গাধা! কিছুই যদি জানোনা, এসে মরেছ কেন আমায় জ্বালাতে। ভীম, ভীম, এই পোড়ার-বাঁদর দুটো আমার প্রাণটা খেলে।

পাশের ঘর থেকে ভীমবাবু বেরিয়ে এলেন। ভীমবাবু প্রবীণ উকিল; শান্ত, সংযত, ভারি ভদ্র। ভীমবাবু আমাদের দিকে চাইলেন।

মাণিক বললে—আমি তো সবই বলছি ; উনি কানে কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না ; শুধু শুধু আমার ওপোর রেগে উঠছেন।

মাণিক যা যা বললে, ভীমবাবু ডাক্তারের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জানালেন। সব শুনে স্লিপের তাড়া থেকে একখানা টেনে নিয়ে খুব মোটা একটা কলম দিয়ে খস্ খস্ করে ঔষধপত্র (প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন) লিখে দিলেন ডাক্তার বসু। পিছনের ঘর থেকে ছোকরা কম্পাউণ্ডার সেটি নিয়ে গেল ওষুধ তৈরী করতে।

মিনিট পনেরো-কুড়ি পরে মাথা চুলকোতে চুলকোতে কম্পাউণ্ডার ডাক্তারবাবুর কানের পাশে এসে জানালে, সে কিছুই পড়তে পারছেনা।

আবার সিংহনাদ শোনা গেল : ভীম, ভীম, এই হতচ্ছাড়া মুখ্যু কম্পাউণ্ডারকে কোথা থেকে ধরে আনলে ; আমার হাড় জ্বালালে। এটা কিছুই পড়তে পারেনা। একে দিয়ে কী কাজ হবে ? এটাকে বিদেয় কর।

ভীমবাবু আবার এলেন ; ঔষধপত্রটি বেশ করে খানিকক্ষণ দেখে বললেন—বাবা, ওর দোষ দিলে কি হবে ; আমিও তো এর একটি অক্ষরও পড়তে পারছিনা।

—হায়, আমার কপাল ! হায়, আমার কপাল ! তুমিও পড়তে পারলেনা।

ভীমবাবু বললেন—তুমি বলো, আমি লিখে নিচ্ছি।

তাই হোলো।

মিনিট দশ পরে কম্পাউণ্ডার আমাদের ভীমবাবুর ঘরে

যেতে ইশারা করলে। সেখানে কম্পাউণ্ডার জানালে ডাক্তারবাবু যেসব ওষুধের নাম বাতলেছেন তার একটাও তার জানা নেই, এবং এখন তেমন কোনও ওষুধ বাজারে চলেনা। হয়তো বিশ-ত্রিশ বছর আগে ঐসব ওষুধ চলতো।

ভীমবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন: তাও না-হতে পারে; বিশ-ত্রিশ বছর আগের ওষুধগুলোর নামও হয়তো বাবার এখন ঠিক মনে নেই। সেসব ওষুধেরও নাম এখন ভুল বলছেন।

ভীমবাবু আমাদের খুব বকাবকি করলেন: তোমরা আসো কোন্ আক্কেলে; বাবার বুড়ো বয়সে যেমন হয় একটা ভীমরতি ধরেছে—বিরানব্বুই বয়সে, বিশ বছর ছেড়ে দেওয়ার পর, আবার নতুন করে ডাক্তারি শুরু করা। আমরা তো ওঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে যেতে পারিনা। শহরে কত ডাক্তার রয়েছেন তাঁদের কাউকে দেখাও।

ফিরে এসে মাণিকের মাকে সমস্ত ঘটনাটির হুবহু রিপোর্ট দিলাম। ভীমবাবু অন্য ডাক্তার দেখাতে বলেছেন তাও বললাম। সব শুনেও মাণিকের মা খুঁতখুঁত করতে লাগলেন।

বললুম—নীতিনবাবু, কিংবা দেবেনবাবু, কিংবা রামবাবু, এঁদের মধ্যে একজনকে দেখান।

এঁরাই তখন শহরের বড় বিজ্ঞ ডাক্তার। তিনজনেরই বয়স ষাটের কাছাকাছি।

মাণিকের মার—শ্রীযুক্তা ঊর্মিলাসুন্দরীর বয়স প্রায় ষাট।

তিনি অতিশয় বিদুষী মহিলা, কিন্তু কোনও কোনও বিষয়ে প্রাচীনপন্থী। বললেন—মেয়েমহলে পুরুষ-ডাক্তার আনা খুব ভেবেচিন্তে বুঝে-সুঝে তবেই সম্ভব। নীতিন-দেবেন-রামের চরিত্রের বিষয়ে সমস্ত খবরাখবর এখনও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিতে পারিনি, তাদের কেমন করে ডাকি। তা ছাড়া বিশ্বেশ্বরবাবু আমার ছোটবেলা থেকেই আমার ধাত জানেন।

আমি রেগে বললুম—আপনার ধাত জানেন! বিশ্বেশ্বর ডাক্তারের নিজের ধাত-ই যে অনেককাল ছেড়ে গেছে।

শুধু এই নয়। প্রত্যাবর্তনের পর বিশ্বেশ্বর ডাক্তার বাইরের 'কল'-ও (call) পেলেন। ধনী, সোনারূপার ব্যবসায়ী প্রতাপ সাহার নিউমোনিয়া হোলো। খুব বাড়াবাড়ি। শহরের সেরা তিনজন ডাক্তারই—নীতিন-দেবেন-রাম চিকিৎসা করছেন। কিছুই ফল হোলোনা। নাভিশ্বাস উঠলো সেদিন সকালে। ডাক্তাররা হাল ছেড়ে দিলেন। প্রতাপ সাহার বুড়ী গিন্নী এবং বাড়ীর অন্যান্য বৃদ্ধারা কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠলো—বিশ্বেশ্বর ডাক্তার ধন্বন্তরি ; এ বাড়ীতে কত মরা বাঁচিয়েছেন। তিনি আবার ডাক্তারি শুরু করেছেন : তাঁকে এখুনি ডেকে আনো।

লোক ছুটলো।

নিজের গাড়ীতে এলেন বিশ্বেশ্বর ডাক্তার। বাড়ীতে ঢুকেই হাঁক দিলেন—প্রতাপ কোথায় ?

লোকেরা বললে—তিনি দো[illegible]-ঘরে ; শেষ অবস্থা।

চেঁচিয়ে উঠলেন বিশ্বেশ্বর ডাক্তার—হারামজাদারা, এখনও তাকে নামিয়ে আনিস্‌নি। আমি কি বিরানব্বুই বয়সে

সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠবো ? এখুনি নামিয়ে নিয়ে আন প্রতাপকে।

তিনজন ডাক্তার—নীতিন-দেবেন-রাম রোগীর শিয়রে বসে ; রোগীকে সেই অবস্থায় নীচে নামাবার প্রস্তাবে আঁতকে উঠলেন ; মত দিলেন না।

বিশ্বেশ্বর ডাক্তারকে সে-কথা জানাতে গর্জে উঠলেন—কোন্ ছুঁচোটা নামাতে বারণ করেছে, ডেকে নিয়ে আয় তাকে।

তিনজনের কেউই বৃদ্ধ ব্যাঘ্রের সুমুখে হাজির হতে রাজি হলেন না। তবে রোগীকে নড়াতেও দিলেন না।

একটু অপেক্ষা করে বিশ্বেশ্বর ডাক্তার তর্জন করে উঠলেন—দে আমার ফী।

অন্য ডাক্তারদের ডবল ফী পকেটে ফেলে গট্‌গট্ করে গিয়ে গাড়ীতে উঠলেন। রোগী না-দেখেই ফিরে গেলেন ধন্বন্তরি।

বিয়ের পাত্রী

পল্লীগ্রাম বলতে আমার নিবিড় ঘনিষ্ঠ দীর্ঘ পরিচয় মাত্র একটি গ্রামের সঙ্গেই—আমার মামার-বাড়ীর গ্রাম। নিজেদের গাঁয়ে গেছি দু'তিনবার, কিন্তু তার সঙ্গে আলাপটা জমে উঠতে পারেনি।

যখনই মামার-বাড়ী গেছি—মামাদের জ্ঞাতি-প্রতিবেশীদের যে চার-পাঁচখানা বাড়ী, প্রতিটাতেই সম্পূর্ণ আপনজনের স্নেহ-সোহাগ পেয়েছি অঢেল ভাবে। আমি সব ক'খানা বাড়ীরই নাতি—নিজের মামার-বাড়ী আর অন্য ঐ ক'খানা বাড়ীর প্রীতি ও ব্যবহারে কোনও তফাৎ কখনও অনুভব করিনি।

একখানা বাড়ী মিত্তির-দাদু আর মিত্তির-দিদির। ছোটবেলায় তাঁদের দু'জনের কাছ থেকে যেমন পেয়েছি অজস্র আদর-যত্ন, তেমনি আমরা ক'ভাইয়ে মিলে করেছি তাঁদের বাড়ীতে অপরিসীম দৌরাত্ম্য ও অত্যাচার। সারাদিন বাড়ীর জিনিস-পত্তর তছনছ চুরমার করেছি; তাঁদের মেয়েগুলোকে ঠেঙিয়ে, ঠেলে ফেলে দিয়ে হাত-পা-মাথা ভেঙে, বাড়ী তোলপাড় করে ফেলেছি—হাসি-আহ্লাদ ছাড়া একটা কটু কথা কোনওদিন বলেননি।

মিত্তির-দাদু আর মিত্তির-দিদি থাকতেন কল্‌কাতায়। ছুটী-ছাটাতে নিজেদের গ্রামে যেতেন কিছুদিনের জন্যে—যেসময়

আমরাও প্রায়ই মামার-বাড়ী যেতাম। বড় হয়ে কল্‌কাতায় এসে যখন মেসে-হস্টেলে থেকে বি.এ.-এম্‌.এ. পড়তুম—মিত্তির-দাত্থ ও মিত্তির-দিদিকে একেবারে ভুলে থাকতে পারতুম না। মাসে একটাবার অন্ততঃ তাঁদের ওখানে বেড়াতে যেতুম।

একদিন সন্ধ্যে নাগাদ গেছি। মিত্তির-দিদি একতলার চাতালটায় বসে ছিলেন, তাঁর কাছেই বসে পড়লুম। কথা বলতে বলতে জানালেন তাঁর এক জা, যিনি হাজারিবাগে থাকেন, তিনি ওখানে ক'দিন হোলো এসে রয়েছেন তাঁর বড় মেয়েটির বিয়ের ঠিক করার জন্যে।

কিছুক্ষণ পরে বললেন—ওপোরে চল্‌; তোর নতুন দিদিমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে দিই। মিত্তির-দিদিমা ওপোরে যে ঘরে নিয়ে গেলেন সেটা একটা লম্বা বড় ঘর। একটা কম পাওয়ারের বাতি জ্বলছে। দেখলাম ঘরের মাঝখানে একটি অতিশয় সুন্দরী, ছিমছাম, রোগা-পাতলা তন্বী তরুণী দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মাথায় ঘোমটা নেই।

মেয়েটিকে দেখে, আমার বয়সের পক্ষে বোধহয় একটু বেশী পাকামি করেই বলে ফেল্‌লুম—এ তো খাসা দেখতে মেয়ে; এর শীগ্‌গির খুব ভাল বিয়ে হয়ে যাবে।

কথা ক'টি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বিয়ের পাত্রী চকিতে এগিয়ে এসে আমার গালে সজোরে ঠাস্‌ করে একটি চড় কষিয়ে দিয়ে বললেন—তবে রে শালা! তুমি আমার বিয়ে দিচ্ছো! সাধে কি মেদিনীপুরের লোকেদের উড়-জন্তু মেড়া বলে?

এই বলেই তিনি ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি হতভম্ব, হতচকিত ! মিত্তির-দিদিমা ঘরের মেঝেতে হেসে গড়াগড়ি দিচ্ছেন। ক্রমশঃ কানে এলো—সমস্ত বাড়ীময় একটা হাসির হুল্লোড় চলেছে।

খানিক বাদে এক মাসি একটি চোদ্দ-পনেরো বছরের মেয়ের হাত ধরে টানতে টানতে আমার সুমুখে এনে কোনও-রকমে হাসির দমক একটু বন্ধ করে বললে—বিয়ে তো হবে এর ; তুমি যাকে বললে, তিনি তো এর মা।

কী কাণ্ড করে বসেছি বুঝতে পেরেই সে-বাড়ী থেকে তৎক্ষণাৎ কেটে পড়া উচিত ভেবে সরে পড়ছি, এমন সময় মিত্তির-দিদি খপ্ করে হাতটা ধরে ফেললেন; বললেন—শালা, পালাচ্ছো কোথায় ; তুমি আজ যে বেকুবি করেছ, সহজে তোমায় এখান থেকে ছাড়া হবে ভেবেছ ?

তারপর দু'তিনজনে মিলে আমায় ঘিরে বসে রইলেন। বাড়ীর সবাই এক এক বার আসেন, আমায় দেখেন আর হেসে গড়িয়ে পড়েন। ক্রমশঃ দেখি আশেপাশের বাড়ীর ছেলে-মেয়েরাও, এ-বাড়ীর লোকের মুখে শুনে, আমায় চোখে একবার দেখতে আসছেন ! এরকম ফ্যাসাদে জীবনে খুব কমই পড়েছি।

প্রায় ঘণ্টা দুই পরে মিত্তির-দিদি এসে বললেন—তোকে হাজারিবাগের দিদিমা ডাকছে।

তাঁর কাছে যেতে তিনি আমায় কাছে বসিয়ে জিগেস্ করলেন—হ্যাঁরে, আমায় দেখে কত বয়স হয়েছে বলে তোর মনে হোলো যে তুই ঐ কথা বললি আমাকে ?

আমি বললুম—আমার তো মনে হোলো দিদি, তোমার বয়স আঠারো কি উনিশ।

তিনি বললেন—আঠারো কি উনিশ! ওর প্রায় ডবল আমার বয়েস। তবে যাক্, তোর যখন আমায় এতই চোখে ধরেছে, তোকেই আবার বিয়ে করবো দোজপক্ষে।

নারী-হস্তে চপেটাঘাত, লজ্জা ও অপদস্থ—এইসবের পর সান্ত্বনা-স্বরূপ ঐ আশ্বাসটুকু সম্বল করে সেদিন মেসে ফিরলুম। হাজারিবাগের দিদিমার সঙ্গে দ্বিতীয়পক্ষ দূরে থাক্—জীবনে দ্বিতীয়বার আমার সাক্ষাৎ হয়নি।

হারুণ-অল-রশিদের থানা

শিবেনবাবুকে চেনেনা এমন লোক মেদিনীপুর শহরে বাস করেনা। তিনি শহরের একটি বিশিষ্ট, অনন্য, অত্যদ্ভুত চরিত্র। বয়সে আমাদের চেয়ে বেশ ক'বছরের বড়। লেখাপড়ায় ভাল ছেলে ছিলেন; পড়াশুনো আজীবন বজায় রেখেছেন। বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন, কিন্তু কলেজ ছাড়ার পর সাহিত্য, ইতিহাস, অর্থনীতি সব বিষয়েরই বই রীতিমতো পড়তেন।

কেমিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে বি.এস্.-সি. পড়ার সময় শিবেনদার মাথায় কিছু বেমানান রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটলো—তাতেই গোলমালের সূত্রপাত।

লোহা শরীরকে শক্ত করে; মানুষের দেহ-মন লৌহ-কঠোর হওয়া উচিত। ডাক্তাররাও টনিকের সঙ্গে লৌহ সংযোগ করেন। আমার মনে হয়, সোভিয়েট রাশিয়ার বিখ্যাত নেতা স্তালিন (লৌহ-মানব)-এর নাম-কামও এবিষয়ে শিবেনদাকে কিছুটা প্রভাবান্বিত করেছিল।

যাক্, এই ধরনের চিন্তাধারাকে শিবেনদা যেভাবে বাস্তবে রূপায়িত করলেন, তাতে শহরবাসী বিস্মিত ও আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। শিবেনদা রায় দিলেন, লৌহ-মানব হতে হলে খাদ্য হিসেবে কাঁচা লোহা খেতে হবে। বেচারা শিবেনদা বাক্য-যাদুকর, দেশ-নেতা ন'ন। তাই নিজের কথা ও কাজে কোনও

ফারাক রাখলেন না। খাদ্য হিসেবে রোজ সকালে আধপোয়া কাঁটা-পেরেক, সন্ধ্যাতেও আধপোয়া কাঁটা-পেরেক শিবেনদা জলযোগ করতে লাগলেন। কথাটা শুনলে যতই অবিশ্বাস্য মনে হোক, মেদিনীপুর শহরের প্রত্যেকেই জানেন দীর্ঘ ত্রিশবছর শিবেনদা রোজ একপোয়া কাঁটা-পেরেক জলের সঙ্গে গিলে খেয়েছেন, এবং বহাল তবিয়তে ত্রিশটা বছর শহরময় ঘুরে বেড়িয়েছেন।

শিবেনদা পেশা হিসেবে গৃহ-শিক্ষকের কাজ করেন। ছেলেদের পড়ান ভালই। গোল বাধলো এক গন্ধবণিকের পুত্রকে নিয়ে। ছেলেটা গবেট-মার্কা। পড়া ভাল তৈরী করতে পারেনা। শিবেনদা তার ওপোর চটে উঠলেন। একদিন বললেন—বুঝেছি তোর মাথাটা নীরেট; তুই গন্ধবেনের ছেলে, তোর মাথাটা সরেস করতে হলে তোকে রোজ আধপোয়া গন্ধক খেতে হবে। বাবাকে বলবি যেন গন্ধক কিনে দেয়।

তারপর রোজই ছেলেটাকে জিগেস্ করেন—কি রে, আজ আধপোয়া গন্ধক খেয়েছিস্?

দু'তিনদিন চুপ করে থাকার পর ছেলেটা তার বাবাকে মাস্টারমশাই-এর হুকুম জানালে। ভদ্রলোক শুনে, শিবেনদাকে ছাড়িয়ে দিলেন, এবং সবাইকে বলে বেড়াতে লাগলেন শিবেনটা একেবারে ক্ষেপে গেছে, ওটাকে ছেলে পড়াতে দেওয়া মানে সর্বনাশ; আমার ছেলেটাকে গন্ধক খাইয়ে মেরে ফেলতো আর একটু হলে।

মাস্টারি-লাইনে এই ঘটনায় শিবেনদাকে কিছুদিন বেকায়দায় পড়তে হয়েছিল। কিন্তু অত সস্তায় অমন ভাল মাস্টার পাওয়া শক্ত, তাই বরাবরই তাঁর গুটিকয়েক ছাত্র জুটে যেতো।

একদিন কলেজে পড়াতে যাচ্ছি, রাস্তায় শিবেনদার সঙ্গে দেখা। কৌটিল্যর অর্থশাস্ত্রখানা পড়তে চান; আমায় সেটা কলেজ-লাইব্রেরি থেকে ধার নিয়ে তাঁকে পড়তে দিতে অনুরোধ করলেন।

আমি বললুম—চলুন আমার সঙ্গে কলেজে।

অধ্যাপকদের বসবার ঘরে তিন-চারজন অধ্যাপক বসে। আমি তাঁদের বললুম—শিবেনদা এখন রোজ আধপোয়া করে কাঁটা-পেরেক সকাল-বিকেল জলযোগ করছেন।

সকলেই এটাকে আমার একটা বেয়াড়া রসিকতা মনে করে অবিশ্বাসের হাসি হাসলেন।

আমি শিবেনদাকে জিগেস্ করলুম—আজকের পেরেক কি ইতিমধ্যে খেয়ে ফেলেছেন?

তিনি উত্তর দিলেন—না।

—যদি এখন আধপোয়া পেরেক দিই, আপনি এঁদের সুমুখে তা খাবেন?

—আমার কোনও আপত্তি নেই—দাও।

পেরেকের সন্ধানে ঘোরাফেরা করে পেরেক আধপোয়া পাওয়া গেলনা। তখন একটা দরজা থেকে একটা বড় বল্টু

খুলে নিয়ে এসে, শিবেনদাকে দিয়ে জিগেস্ করলুম—এটা খাওয়া চলবে ?

সেটা হাতে নিয়ে শিবেনদা বললেন—আধপোয়ার বেশী হবেনা—চলবে ; এক গ্লাস জল নিয়ে এসো।

ব্যাপার দেখে, অন্যান্য অধ্যাপকরা চেঁচিয়ে উঠলেন—বিনয়, খবরদার! ফাজলামি করতে করতে লোক খুন করবে ; আমরাও সব দায়ী হয়ে পড়বো।

আমি ছুটে গিয়ে এক গ্লাস জল নিয়ে এলুম। এক ঢোঁক জল মুখে নিয়ে শিবেনদা টপাস্ করে বল্টুটা মুখে ফেলে দিয়ে কোঁক্ করে গিলে নিলেন। তারপর ঘণ্টাখানেক বসে থেকে সবার সঙ্গে সরস, মার্জিত, বুদ্ধি-দীপ্ত আলাপ-আলোচনা করলেন নানা বিষয়ে। কাণ্ড-কারখানা দেখে সবাই বিস্ময়ে অভিভূত।

সাত-আটদিন পরে শিবেনদা কলেজে এসে হাজির। আমায় ঠাট্টা করে বললেন—হ্যাঁ হে বিনয়, সেদিন আমায় কলেজে নেমন্তন্ন করে এনে খাওয়ানোর মধ্যে খাওয়ালে একটা লোহার বল্টু। অতিথি-অভ্যাগতদের লোকে সন্দেশ-রসগোল্লা খাওয়ায়।

শিবেনদার কথায় খুবই অপ্রস্তুত ও লজ্জিত হোলাম। তাড়াতাড়ি কলেজের একজন বেয়ারাকে বললুম—একটাকার সন্দেশ নিয়ে আয় এক্ষুনি—

বাধা দিয়ে শিবেনদা বললেন—অত সস্তায় কিস্তিমাৎ চলবেনা। খাওয়াবে তো, একটা খাওয়ানোর মতো খাওয়াও।

—কী খেতে চান বলুন।

—হারুণ-অল-রশিদের একটা ডিনার খাওয়াও।

—হারুণ-অল-রশিদের খানা ?

—জানো তো, হারুণ-অল-রশিদের একটা খানার দাম ছিল বত্রিশ গিনি।

—সে আমি কোথায় পাবো ?

—খাওয়াতে পারবেনা ; বেশ, একগ্লাস জল আনতে বলো।

জল এলে, শিবেনদা দুটো খাম পকেট থেকে বের করলেন ; একটা খাম উল্‌টোতে ঝন্‌ঝন্ করে ষোলোখানা গিনি টেবিলের ওপোর পড়লো ; শিবেনদা চট্ করে সেগুলো তুলে নিয়ে এক ঢোঁক জলের সঙ্গে ষোলোখানা গিনি গিলে ফেললেন। তারপর দ্বিতীয় খামটা থেকে আরও ষোলোটা গিনি বার করে গলাধঃকরণ করলেন।

বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে আমরা সবাই চেয়ে রইলুম। আমার দিকে মৃদু হেসে শিবেনদা বললেন—কী, তুমি তো খাওয়াতে পারলেনা ; আমি নিজেই বত্রিশ গিনির ডিনার খেলুম।

আমরা বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে বসে আছি দেখে, একটু বাদে বললেন—বিনয়কে আজ ঠকাবো বলে পোস্ট-অফিসে গেলুম ; সেখান থেকে বত্রিশটা আন্‌কোরা নতুন আধপয়সা নিয়ে আসছি। ঐগুলোই খেলুম।

যাকে সবাই বিকৃতমস্তিষ্কই ভাবে—তার হৃদয়ে আমার প্রতি এই স্নেহ-মমতা, ও এই উজ্জ্বল হাস্যরস দেখে সকলে অবাক। লোকটির জন্যে অব্যক্ত ব্যথায় ভরে ওঠে সবার মন।

ধরম্ তো চলা গিয়া

আমার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে বড় যাঁরা—তাঁদের এককালে খুব ধন-দৌলত নাম-ডাক ছিল। দেশে দ্বাদশ শিবমন্দির, অনেক কীর্তি-কলাপ। শহরের বাড়ীতেও একটি সদাব্রত ও ধর্মশালা রেখেছিলেন বহুবছর। কালে ভূসম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে অবস্থা পড়ে এলো—সদাব্রত, ধর্মশালা উঠে গেল।

জোয়ান বয়সে এক হিন্দুস্থানী সাধু তীর্থে গেছ্‌লো পুরীতে বারাণসী হ'তে পায়ে হেঁটে অহল্যাবাই রোড ধরে। ঐ ধর্মশালায় আহার ও বিশ্রাম করেছিল দু'তিনদিন।

পঁচিশ বছর পরে সেই সাধু, এখন আধ-বুড়ো, আবার চলেছে পুরী সেই রাস্তা ধরে হেঁটে। কী স্মরণশক্তি লোকটার! মেদিনীপুরে এসে প্রায় সেই বাড়ীর আশেপাশে ধর্মশালাটা খুঁজে বের করবার চেষ্টা করছে। ধর্মশালা কিন্তু তার বছর পনেরো আগে উঠে গেছে। অনেকেই তখন জানেনা যে ধর্মশালা একটা ছিল সেখানে কিছুকাল আগে।

সাধুটি কয়েকজনকে জিগেস্ করলে—বাবুজী, য়হাঁ এক ধরম্‌শালা থা, উস্‌কা পতা দীজিয়ে।

তারা কেউ কিছুই বলতে পারলেনা। তারপর যাঁকে সাধু প্রশ্ন করলে তিনি একজন বৃদ্ধ প্রতিবেশী—যাঁর সঙ্গে

বড়বাড়ীর মালিকদের বেশ মামলা-মোকদ্দমা চলছে। তিনি সাধুজীকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বড়বাড়ীর দেউড়ি পার হয়ে পূর্বতন ধর্মশালার ভগ্ন, পরিত্যক্ত, শূন্য কুঠরি ক'খানা দেখালেন। বড়বাড়ীর সেদিনের কর্তারা যে-বৈঠকখানায় বসেছিলেন সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে বললেন—দেখো, ধরম্ তো চলা গিয়া, শালালোগ্ উঁহা বৈঠে হ্যায়।

কলেজের হেড-ক্লার্ক

বাংলাদেশের মফস্বল কলেজগুলোর মধ্যে মেদিনীপুর কলেজ পুরোনো। বহুপূর্বে এটি সরকারী কলেজের পর্যায়ে পড়তো। একসময় মোটা বেতনের একজন খাঁটি ইংরেজ প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। কলেজটির সঙ্গে আমার বংশের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ও বহুযুগের। আমার ঠাকুর্দা ও আমার বাবা ঐ কলেজে পড়েছেন ; আমি নিজে ঐ কলেজে পড়েছি ও পড়িয়েছি। এই তিনপুরুষে পরিবারের অন্যান্য অনেকেও ঐ কলেজে পড়েছেন।

আমার বাপ, জ্যাঠা, কাকা যখন কলেজে পড়তেন, তখন জাত-সাহেব প্রিন্সিপাল না থাকলেও, যিনি ছিলেন তিনি বড় কম যেতেন না। প্রিন্সিপাল আর. এল. মৈত্র কেম্‌ব্রিজের গ্র্যাজুয়েট ; ধর্মে খ্রীষ্টান ; বিলেত থেকে পাকা মেম বিয়ে করে এসেছিলেন ; আদব-কায়দায়, চাল-চলনে, কথাবার্তায়, আচারে-ব্যবহারে পুরো সাহেব।

এহেন প্রিন্সিপালের হেড-ক্লার্ক—বলতে গেলে আপিসের সবে-ধন-নীলমণি কেরানী—চপলাবাবু একটু অসাধারণ। ফার্স্ট আর্টস পাস-করা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ চপলাবাবু ; পোশাক-আশাক সাদা-সিধে বাঙালীর। বৈশিষ্ট্য তাঁর দুটি—একটি ভাল, একটি মন্দ।

কেম্‌ব্রিজ গ্র্যাজুয়েট, ইংরেজির অধ্যাপক প্রিন্সিপাল আর. এল. মৈত্র বিস্ময়ের সঙ্গে আবিষ্কার করলেন যে এই

মফস্বল কলেজের সামান্য হেড-ক্লার্ক চপলাবাবু ইংরেজি লেখেন চমৎকার, বলেন চোস্ত। বয়সে চপলাবাবু প্রিন্সিপাল মৈত্রের চেয়ে ঢের বড়। মহাকবি মাইকেলের উৎকট সাহেবিয়ানার বাহ্যরূপ সত্ত্বেও অন্তরে তাঁর ছিল বাঙালীয়ানা ষোলো-আনা ; প্রিন্সিপাল আর. এল. মৈত্র যতই খ্রীষ্টান সাহেব হোন্, মনের ভিতর 'ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণং গতিঃ' এই মহাবাক্যের প্রভাব সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তাই প্রিন্সিপাল আর. এল. মৈত্র চপলাবাবুকে সত্যই শ্রদ্ধা করতেন।

মুশকিল বাধতো চপলাবাবুর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করে। দিনরাত লালপানি খেয়ে তিনি উচ্চ তারে বাঁধা, সময়ে সময়ে একেবারে বেতার। প্রিন্সিপাল তাঁর ঘর থেকে 'চপলাবাবু' 'চপলাবাবু' বলে উচ্চৈস্বরে হাঁকছেন ; পাশের ঘরেই চপলাবাবু ; কিন্তু কোনও সাড়া মিলছেনা ; তখন সকাল এগারোটা ; সেই কলেজ বসছে ; রেগে উঠে এসে প্রিন্সিপাল দেখলেন হেড-ক্লার্ক টেবিলের উপর শুয়ে বেহুঁশ ; শহরের গড়পরতা হিসেবে যত মাছি থাকা উচিত তার চার-পাঁচগুণ বেশী মাছি টেবিলটার ওপোর ভন্‌ভন্ করছে। নড়া ধরে চপলাবাবুকে খাড়া করে দিয়ে প্রিন্সিপাল মৈত্র হেড-ক্লার্ককে কঠোর ভৎ র্সনা করলেন।

ঘণ্টা দুই পরে একটু ধাতস্থ হয়ে, চপলাবাবু প্রিন্সিপালের ঘরে গেলেন গায়ের ঝাল মেটাতে। বললেন—মনে রেখো প্রিন্সিপাল মৈত্র, তুমি একটা কলেজের মাথা ; তোমার ভোলা উচিত নয় একটা কথা—বয়স্কদের শ্রদ্ধা দেবে (Age should be respected) ; আমার বয়স তোমার ডবল। তুমি একটু

আগে আমায় যা-ইচ্ছে অপমান করলে ; আমি জিগেস্ করি প্রিন্সিপালের এই দৃষ্টান্ত দেখে ছাত্ররা কী শিখবে।

প্রিন্সিপাল মৈত্রের রাগ এতক্ষণে পড়ে গেছ্লো। তিনি হাতজোড় করে তাঁর রূঢ় আচরণের জন্যে চপলাবাবুর কাছে মাপ চাইলেন। শুধু বললেন—চপলাবাবু আপনি যদি এভাবে চলেন, সব সময় মেজাজ ঠাণ্ডা রাখি কী করে।

অবশ্য এরপরও মাঝে মাঝে ঐরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়ে চললো।

প্রিন্সিপাল আর. এল. মৈত্র মধ্যে মধ্যে নিজের মাইনে থেকেও চপলাবাবুকে অর্থসাহায্য করতেন। তবু চপলাবাবুর মনের গহনে প্রিন্সিপাল মৈত্রের প্রতি একটা আক্রোশের ভাব জমে উঠছিল।

একটা ছুটীর দিন সকাল দশটা নাগাদ চপলাবাবু তাঁর বাড়ীর রাস্তার ধারের রোয়াকে বসে আছেন। শরাবের খোঁয়ারি তখনও ভাঙেনি। দুটো কলেজের ছেলে সুমুখ দিয়ে যাচ্ছে ; চপলাবাবু তাদের ডেকে বললেন—তোদের প্রিন্সিপাল আর. এল. মৈত্র ব্যাটাকে আগাপাস্তালা জুতিয়ে হাড় ভেঙে দিয়েছি।

ছাত্র দু'জন কৌতূহলান্বিত হয়ে জিগেস্ করলে—প্রিন্সিপালকে কোথায় জুতো-পেটা করলেন, স্যার।

—কেন, এখানেই, আমার বাড়ীতে। তোরা দেখবি, আয়, ভিতরে ; ব্যাটাকে আর একবার উত্তম-মধ্যম দেবো।

ছেলে দুটি ভাবলে প্রিন্সিপাল মৈত্র চপলাবাবুর বাড়ীর ভিতরই আছেন ; অধীর ঔৎসুক্যে তারা ছুটে ভেতরে গেল।

চপলাবাবু উঠোন থেকে একটি লাল খোলামকুচি কুড়িয়ে নিয়ে দেওয়ালের গায়ে লিখলেন 'আর. এল. মৈত্র', এবং নিজের চটি খুলে ঐ লেখা নামটির ওপোর সজোরে পটাপট মারতে লাগলেন; ছাত্র দু'জনের দিকে চেয়ে বললেন—দেখলি তো ব্যাটাকে কী জুতোন জুতোলুম।

কিছুকাল পরে যিনি ঐ কলেজে হেড-ক্লার্ক হলেন তিনিও গভীর-জলপথ-যাত্রী; তবে অমলবাবু কাজে চৌকোশ ও হুঁশিয়ার, এবং খুব আমুদে হাস্য-পরিহাস-প্রিয় লোক।

জেলা ও দায়রা জজ মিঃ মেহের আলি, আই.সি.এস্.-এর অ্যাপেন্‌ডিসাইটিসের ব্যথা উঠলো সন্ধ্যাবেলায়; রাত্রি একটার ট্রেনে তাঁকে কল্‌কাতা নিয়ে যাওয়া হোলো মেডিকেল কলেজে অস্ত্রোপচারের জন্যে। সকালে এ-খবরটা শহরের অনেকেই জানলে।

কলেজ বসেছে; হেড-ক্লার্ক প্রিন্সিপালকে এসে বললেন: ভেবে দেখুন, স্যার, কলেজও আজ ছুটী দিতে হবে কিনা; আদালত সব তো বন্ধ হয়ে গেল; কিছু আগে খবর এসেছে জজ মেহের আলি মারা গেছেন।

প্রিন্সিপাল একটু ভেবে রায় দিলেন: তা এখানকার জেলা ও দায়রা জজ ছিলেন; সম্মানার্থে ছুটী দিতে হয়।

হেড-ক্লার্ক বললেন: তা হ'লে ছুটীর সার্কুলারটা দিয়ে দিই, স্যার।

—হ্যাঁ, দাও।

জজ মেহের আলি কিন্তু মারা যাননি; তাঁর মরার কোনও খবর আসেনি; আদালতও বন্ধ হয়নি।

মিঃ মেহের আলি সেরে ফিরে আসার পর তাঁর পেশকার-সেরেস্তাদারদের মধ্যে কেউ কানে তুলে দিলে কলেজ তাঁর মৃত্যুতে বন্ধ হয়েছিল।

হঠাৎ একদিন বিকেল তিনটের সময় জজ মেহের আলি নিজের এজলাশ ছেড়ে কলেজে উপস্থিত। খট্‌খট্ করে সোজা প্রিন্সিপালের কামরায় গিয়ে কলেজের সার্কুলার-বই চাইলেন। বই এলে, পাতা উল্‌টে তাঁর মৃত্যু-সংবাদের সার্কুলারটা বার করে প্রিন্সিপালের চোখের সুমুখে ধরে বললেন—প্রিন্সিপাল, আমি মারা যাইনি তা তো তুমি দেখতেই পাচ্ছো; মাঝ থেকে ফাঁকি দিয়ে একটা ছুটী ভোগ করে নিলে। কলেজের পরিচালনা এবং পড়াশুনা কি এইভাবেই চলছে!

যাক্, খানিকটা বকাবকি করে তিনি চলে গেলেন। তার বেশী কিছু করেননি।

জজসাহেব চলে গেলে, প্রিন্সিপাল হেড-ক্লার্ককে ডেকে তুখ্যু জানালেন: অমল, তুমি এক-একটা কী কাণ্ড করে বসো। অপদস্থ ও বেইজ্জতের একশেষ হতে হোলো।

মাথা চুলকোতে চুলকোতে অমলবাবু মন্তব্য করলেন—একদিন ছুটী পাওয়ার বদলে কিছু গাল খাওয়া; লোকসানটা এমন কী, স্যার।

অধ্যাপকদের বসবার হলে আমরা ক'জন গল্প করছি।

অমলবাবু তাঁর কামরা থেকে হেঁকে বললেন—হরিচরণবাবু, এই নতুন ছোকরাটিকে কলেজের মালির কাজে ভর্তি করছি; আপনারা একে একটু পরীক্ষা করে দেখুন একে দিয়ে কাজ চলবে কিনা।

একটি পাড়াগেঁয়ে বছর বিশের ছোকরা এসে দাঁড়ালো। হরিচরণবাবু তাকে তার নাম জিগেস্ করলেন।

ছেলেটি একটু থেমে উত্তর দিলে—গোব্রে ডাউন (Gobré Down)।

হরিচরণবাবু চম্‌কে উঠে জিগেস্ করলেন—কী বললে?

ছেলেটি—গোব্রে ডাউন।

হরিচরণবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন: অমলবাবু, এই হতভাগা ছোঁড়াটাকে কে আনলে? এটাকে দূর করে দিন; এর দ্বারা কোনও কাজ হবেনা; নাম বলছে গোব্রে-ডাউন।

প্রফেসর দত্ত ঠাণ্ডা, ধীর লোক: তিনি আস্তে আস্তে ছেলেটিকে জেরা শুরু করলেন—তুমি কি খ্রীষ্টান?

—এজ্ঞে না, আমি হিন্দু।

—তোমরা কী জাত?

—এজ্ঞে, আমরা মাহিষ্য।

—তোমার বাড়ী কোথায়?

—এজ্ঞে, গোপীবল্লভপুরে।

—এর আগে তুমি কল্‌কাতায় বা অন্য কোনও শহরে গেছ্‌লে, বা কাজ করেছিলে?

—এজ্ঞে না, কুথাও যাইনি; বাড়ী থেকে হেথা আসছি।

হতাশ হয়ে অধ্যাপক দত্ত বললেন : তা হলে তোমার নাম গোব্রে-ডাউন কী করে হোলো।

এতক্ষণে অমলবাবু হাসতে হাসতে উপস্থিত হলেন। বললেন—ওর কোনও দোষ নেই। ও নাম বললে—গোবর্ধন। আমি ওকে ভয় দেখালুম গোবর্ধন নাম বললে এখানে চাকরি হবেনা। আপনাদের দেখিয়ে বললুম, ঐ যে যাঁরা ও-ঘরে বসে আছেন ওঁরা সব সাহেব। গোবর্ধন নাম শুনলে তোমাকে রাখতে দেবেন না। আধঘণ্টা ধরে কসরতের পর ওর মুখে গোব্রে-ডাউনটা সড়গড় হলে আপনাদের কাছে পাঠালুম ওকে পরীক্ষার জন্যে।

অমলবাবু নিজে ছিলেন আমুদে লোক তাই দশজনকে আমোদ বিতরণ করতেও জানতেন।

কৃষ্ণবাবু কলেজে কাজ করতেন, সঙ্গে সঙ্গে কন্‌ট্রাক্‌টারিও। খড়্গাপুরে এক ভদ্রলোকের ছোট কারখানার কয়লা-সাপ্লাই-এর কনট্রাক্‌ট্‌ নিয়েছিলেন কৃষ্ণবাবু। ওয়াগন যোগাড় করতে না পারায় কয়লা যোগান দিতে পারলেন না। ভদ্রলোকের কারখানা বন্ধ হয়ে গেল। কৃষ্ণবাবু খবর পেলেন দুপুরের ট্রেনে কারখানার মালিক কল্‌কাতা থেকে কলেজে আসছেন তাঁর মোকাবেলা করতে।

কলেজের মধ্যেই একটা হাঙ্গাম-হুজ্জোত করবেন এই ভয়ে কৃষ্ণবাবু হেড-ক্লার্ককে বললেন—আমি সরে পড়ছি; অমল ভাই, তুমি যেমন করে হোক্ লোকটাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা কোরো ; যেন কলেজে কোনও বিশ্রী ব্যাপার না করে।

অমলবাবু বললেন: যে আজ্ঞে; আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে যান; সে আমি যাহোক্ করবো।

দুপুর দুটো নাগাদ ভদ্রলোক কলেজের আপিসে এসে হাজির। হেড-ক্লার্ককে বললেন: আপনাদের কৃষ্ণবাবুকে একবার দয়া করে ডেকে পাঠান তো এখানে; চাকুরিও করবেন, আবার ব্যবসা করা চাই; দুধও খাবেন, তামাকও খাবেন; আমায় একেবারে ডুবিয়ে দিলে।

অমলবাবু (প্রকাণ্ড দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে): হায়! হায়! কী নামই করলেন! সব শেষ! পরশু রাতে কলেরা হোলো, ভোরেই সব হয়ে গেল।

ভদ্রলোক—অ্যাঁ, কী বললেন, কৃষ্ণবাবু মারা গেছেন!

খানিকক্ষণ গুম্ হয়ে থেকে মনে-মনেই বিড়বিড় করলেন: নিজেও গেল, আমাকেও মেরে গেল।

অমলবাবু—কমবয়সী বিধবা আর তিনটে কচি বাচ্চা, আহা-হা!

ভদ্রলোক আরও দু'এক মিনিট হতভম্ব হয়ে বসে থেকে আস্তে আস্তে হাঁটা দিলেন।

পরের দিন কৃষ্ণবাবু এসে ব্যগ্র প্রশ্ন করলেন: লোকটা এসেছিলো?

হেড-ক্লার্ক—হ্যাঁ।

—কী করলে?

—আমি তাকে এমনি ম্যানেজ করলুম বাছাধন কিছুই করতে পারেনি।

—চেঁচামেচি করলে নাকি ?

—সে-সুযোগই আমি তাকে দিইনি।

—"বাঁচালে, ভায়া", বলে কৃষ্ণবাবু হাঁপ ছাড়লেন। —তোমায় কী বলে যে ধন্যবাদ জানাই।

অমলবাবু কী কৌশলে যে ভদ্রলোককে ম্যানেজ করলেন তার উচ্চবাচ্য হোলোনা।

হপ্তাখানেক বাদে ওয়াগন পেতে—কৃষ্ণবাবু আবার ভদ্রলোকের কারখানায় কয়লা চালান দিলেন। বিলম্বের জন্যে মাপ চেয়ে চিঠি লিখলেন, এবং নিজের বিল্ পাঠালেন।

মাসখানেক বাদে আর-এক দুপুরে হেড-ক্লার্কের কামরায় ভীষণ হৈ-হুল্লোড়! ছুটে দেখতে গেলুম ব্যাপার কী।

হেড-ক্লার্কের সুমুখে টেবিলের ওধারে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক বসে; রাগে মুখ-চোখ লাল; টেবিলের ওপোর ঘুষি মারছেন, আর চেঁচাচ্ছেন—দেখুন তো মশাই, কী অদ্ভুত লোক! সেদিন কৃষ্ণবাবু কলেরায় মারা গেছেন বলে আমায় হাঁকিয়ে দিলেন।

অমলবাবু—আপনি কম অদ্ভুত কিসে? একটা লোক মারা যায়নি, বেঁচে আছে শুনে চেঁচামেচি করছেন।

ভদ্রলোক—আপনি একটা দায়িত্বশীল পদে আছেন, আপনার কি কোনও দায়িত্বজ্ঞান নেই ?

অমলবাবু—সহকর্মীর প্রতি দায়িত্ববোধেই তো এই ফ্যাসাদে পড়েছি।

ভদ্রলোক—কী বে-আক্কেল লোক, মশাই!

অমলবাবু—অনেক আক্কেল খরচ করেই তো সেদিন কথাটা বলেছিলুম আপনাকে।

ভদ্রলোক—আপনি ওরকম ডাহা মিথ্যেকথা কেন আমায় বললেন?

অমলবাবু—এখন দাঁড়াচ্ছে আমার কথাটা ভুল। কিন্তু আপনি জিদ্ ধরেছেন আমার কথাটা কেন সত্য হোলোনা, অর্থাৎ কৃষ্ণবাবু সত্যি-সত্যি মারা না গেলে আপনি কিছুতেই খুশী হবেন না। একটা লোক মারা যায়নি, বেঁচে আছে—এ খবর তো আনন্দের, আর আপনি সেইজন্যে রেগে অস্থির।

ভদ্রলোক—আমি কারও মৃত্যু-কামনা করিনা; কিন্তু আপনি মিথ্যেকথা বলে আমায় সেদিন কেন খেদিয়ে দিলেন?

অমলবাবু—মিথ্যেকথা! মিথ্যেকথা! আরে মশাই, একবার ভেবে দেখেছেন কৃষ্ণবাবু সত্যি যদি মারা যেতো—বিধবাটার আর অপগণ্ডগুলোর ভার নিতো কে?

ভদ্রলোক ক্রোধে দিশেহারা হয়ে উঠে পড়লেন। "এইসব বাজে লোক আবার কলেজে কাজ করে"—গজ্‌গজ্ করতে করতে বেগে প্রস্থান করলেন।

হেড-ক্লার্ক হেসে লুটোপুটি।

শিল্পে বোধোদয়

শিল্প-সঙ্গীতের মন্দাকিনী ধারা এবং শিলা-উপল-আকীর্ণ আমার জীবনের স্রোত জ্যামিতির দুটি সমান্তরাল রেখা—মিল হোলোনা কোথাও, মিশ খেলোনা কোনওদিন।

স্কুলে ঘোড়া আঁকতে দিলে, আমার হাত দিয়ে নয় হাতি, নয় হরিণের মতো একটা কিছু বেরিয়ে আসতো ; আম আঁকতে বললে, আমার রেখার টানে সেটা কমলালেবুর আকার ধারণ করতো। যৌবনে একবার গান শেখার সখ হয়েছিল। মাসখানেক কসরতের পর ওস্তাদজির মুখে কৌতুকের চাপা হাসি নজরে পড়তো,—কিছু বলতেন না, কিন্তু কেমন যেন ঢিলে দিলেন বুঝতে পারলুম। তখন আমি কলেজের অধ্যাপক। লজ্জায় ওস্তাদজি মুখের ওপোর সাফ জবাব দিতে পারছিলেন না।

একদিন সকালে গিয়ে গৎ ভাঁজছি ; ওস্তাদজি বাড়ী নেই ; হঠাৎ ওস্তাদজির স্ত্রী হাসতে হাসতে বললেন—আপনি বাড়ী যান ; আর আসবেন না ; সাতজন্মেও আপনার গলা দিয়ে গান বেরুবেনা।

ওস্তাদজির গিন্নী আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর ভগ্নী। তাই তাঁর কথাগুলো বলতে একটুও সঙ্কোচ হোলোনা।

এ-ছাড়াও 'সংস্কৃতি' কথাটার আসল অর্থ কী বোঝবার চেষ্টা করলেই আমার প্লীহা-বিকৃতির (পিলে-চমকানোর)

লক্ষণ দেখা দেয় ; 'কৃষ্টি' শব্দটা শুনলেই মাথার ভেতর শুরু হয়ে যায় কালবোশেখীর ঝড়-বৃষ্টি। ওসব উঁচু ব্যাপারের তাই ধারে-কাছেও হাঁটিনা। যতসব অনাছিষ্টি !

মাঝবয়সে ইংরেজ শাসকদের নেকনজরে পড়ে গেলুম জেলখানার কয়েদী হয়ে। একটা দশ ফিট চওড়া, পঁচিশ ফিট লম্বা হলের মধ্যে থাকতে হোলো তিনটে বছর বাংলাদেশের বিপ্লবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, প্রাজ্ঞ, প্রাচীন জনকয়েকের সঙ্গে। দোহাই আপনাদের, ভুল করে বসবেন না ; আমি ওঁদের সঙ্গে ছিলুম বলে ভাববেন না—আমিও একজন বড়সড় বিপ্লবী,— আমি একজন ছোটখাটোও ওধরনের কিছুই নই। প্রাজ্ঞ পণ্ডিতের বদলে আমি একটি মূর্খ, অর্বাচীন। নিছক ঘটনাচক্রে ওঁদের মধ্যে গিয়ে পড়েছিলুম—হংসো মধ্যে বকো যথা।

ওঁদের মধ্যে চিত্তমোহনবাবু সবচেয়ে ধীর, স্থির, বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ। পড়াশোনাও তাঁর প্রচুর। তখন তিনি মোটা মোটা, দামী দামী বই আনাচ্ছেন, আর পড়ছেন—বিদেশীয় ও ভারতীয় চিত্র-শিল্প সম্বন্ধে। একখানা বইও লিখছেন। জিগেস্ করে জানলুম বইখানার প্রতিপাদ্য—রবীন্দ্রনাথ কবি অপেক্ষা চিত্র-শিল্পী হিসেবেই সমধিক সুমহান। শুনে রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলুম। রবীন্দ্র-সাহিত্যের জ্ঞানই আমার প্রায় শূন্যের সামিল ; রবীন্দ্র-চিত্র-শিল্প চোখে দেখিনি বলাই চলে। এ অবস্থায় লেখায় রবীন্দ্রনাথ ও রেখায় রবীন্দ্রনাথের তুলনা-মূলক বিচার আমার দ্বারা চন্দ্রলোকের অধিবাসীর গুণাগুণ বিশ্লেষণের মতোই অসম্ভব।

পড়াশুনো কিছুই করিনা; খাটে চুপচাপ শুয়ে পড়ে থাকি; কখনও কখনও শুয়ে-শুয়ে পা নাচাই। চিত্তমোহনবাবু লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে আড়চোখে আমায় মাঝে মাঝে দেখেন। কেন জানিনা এই নিষ্কর্মা অধমকে শিল্প-রসিক করার বাসনা হঠাৎ তাঁর মনে জাগলো। নিজের নূতন মৌলিক আবিষ্কার নিয়ে—কবি অপেক্ষা চিত্র-শিল্পী-রূপেই রবীন্দ্রনাথের স্থান অধিক উচ্চে—তিনি তখন মশগুল। বোধহয় নিজের এই বিস্ময়কর উদ্ভাবনের সমর্থক ও সাকরেদ একজন খুঁজছিলেন। আমি সামনে পড়ে গেলুম।

চিত্তমোহনবাবু বললেন রোজ সকাল আটটা থেকে দশটা আমায় শিল্প সম্বন্ধে তিনি বোঝাবেন। পর পর সাতদিন সকালে দু'ঘণ্টা নীরবে মন্ত্রমুগ্ধের মতো নিবাত-নিষ্কম্প বসে থাকতুম—শুনতুম শিল্প-সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা।

সাতদিন পরে চিত্তমোহনবাবু ঠিক করলেন পরীক্ষা করে দেখবেন শিল্পে আমার বোধোদয় হোলো কিনা। তিনি বললেন—দেখুন, একখানা ছবি দেখে আপনার মনে যে যে ভাবের উদয় হবে অকপটে বলে যান। চিত্র-শিল্পের সমঝদার ও সমালোচক হওয়ার এই শিক্ষা-সোপান।

এরপর রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত একটি বিখ্যাত চিত্র আমার চোখের সুমুখে ধরে আমায় বললেন—এই ছবিটি দেখে আপনার মনে যে যে কথা আসছে—যা মনে হচ্ছে তাই বলে যান।

আমি প্রশ্ন করলুম—আজ্ঞে, আমার মনে যা আসছে তাই বোলবো তো?

চিত্তমোহনবাবু উত্তর দিলেন—হ্যাঁ, ঠিক তাই।

আমি আরও দু'বার ঐ একই প্রশ্ন করলুম, এবং একই উত্তর পেলুম।

তারপর আমি শুরু করলুম : দেখুন চিত্তমোহনবাবু, আমার সবচেয়ে ছোট ভাইটা ভারি দুষ্টু ; তার নাম বুড়কা ; তার বয়েস সাত কি আট। আমার একটা বদ-অভ্যেস—যখনি কোনও বই পড়ি—সঙ্গে একটা লাল-নীল পেন্সিল রাখি, এবং যেখানটা ভাল লাগে, দাগ দিই। আমার ঐ ছোট ভাইটা এমনি নচ্ছার যে, যখনি পড়তে পড়তে একটু উঠে যাবো—সে দৌড়ে এসে লাল-নীল পেন্সিলটা দিয়ে বই-এর পাতায় পাতায় আঁচোড়-পোঁচোড় কেটে গবড়ে দেবে। ছবিখানা দেখে বুড়কার গবড়ানো বই-এর পাতাগুলোর কথা আমার মনে পড়ছে।

রবীন্দ্র-চিত্র-শিল্পের এই সমাদরে রাগে ও দুঃখে চিত্তমোহনবাবুর নাক ফুলে উঠলো ; চোখ বড় বড় হয়ে জলে ভরে এলো। শান্ত, সংযতবাক্ চিত্তমোহনবাবুর মুখ দিয়ে শুধু একটি কথা সজোরে উচ্চারিত হোলো—বর্বর !

প্রিয়দর্শনের পরিচ্ছন্নতা

রবীন মজুমদার জলপাইগুড়ির ছেলে। পলিটিক্সে এম্.এ. পড়তো; ল-ও পড়তো সঙ্গে সঙ্গে। শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট মেসে দোতলার পশ্চিমের কোণার ছোট ঘরটায় একলা থাকতো। দেখতে রাজপুত্তুর; রং কাঁচাসোনা; মুখের গড়ন চমৎকার; ছিপছিপে লম্বা চেহারা। বুদ্ধি প্রখর; তর্ক-আলোচনায় ক্ষুরধার। মাথা চক্‌চকে, দেহ ঝক্‌ঝকে, কিন্তু রীত্‌ পরিচ্ছন্নর বিপরীত।

আমার কাছ থেকে একখানা মোটা পাঠ্য কেতাব পড়ার জন্যে চেয়ে নিলে। সে বইখানা ওরও পাঠ্য।

দু'মাস পরে বইটা চাইলুম। খোঁজাখুঁজি করে বললে—আমার কাছে পাচ্ছিনা তো; তোকে নিশ্চয় ফেরৎ দিয়েছি।

আমি বললুম—ফেরৎ নিশ্চয় দাওনি।

ব্যাপারটা এই অবস্থায়। হঠাৎ একদিন রবির ঘরে চেয়ারে বসে নজর পড়লো—শোবার খাটখানা পায়া চারটের তলায় ইট দিয়ে উঁচু করা। তিনটে পায়ার নীচে তিনখানা থান-ইট; কিন্তু আর একটার নীচে যে-জিনিসটা সেটা একখানা বই বলে সন্দেহ জাগলো। রবি সেখানার ওপোর মাথায় মাথার তেল—কোকোলার বোতলটা রাখে। তেল গড়িয়ে গড়িয়ে ওপোরটা চিটে পড়ায় জিনিসটা একখানা ঝামার মতো মনে হয়—তবে

ঝামার পক্ষে বেশী মসৃণ আর সমতল। উবু হয়ে মেঝেতে বসে সেটা টেনে দেখি আমার কাছ থেকে রবির ধার-করা সেই কেতাবখানা।

রবিকে দেখাতে হা-হা করে হেসে উঠলো : একেবারে ভুলে গেছি ; তিনখানা থান-ইট যোগাড় করতে পেরেছিলুম কোনওরকমে ; আর একখানা কিছুতেই পাওয়া গেলনা। তাই ঐ বইখানা দিয়ে কাজ চালিয়ে নিলুম।

আমি বললুম—আমার বইখানারই এই দুর্দশা করলি ?

বললে—ঐখানাই ঠিক মাপসই হোলো।

কিন্তু ক্রমশঃ মেসের অন্য ছেলেদের পক্ষে রবির ঘরে ঢোকাই মুশকিল হয়ে উঠলো। এক-একটা কাজ, তা যতই সহজ, হাল্‌কা হোক্‌না কেন—পুরুষদের ধাতে আসেনা ; সেগুলো মার্কা-মারা মেয়েলী কাজ। যার কর্ম তারে সাজে, অন্যে লাঠি-সম বাজে। এই ধরনের একটা কাজ হোলো বিছানার চাদর, আর বিশেষ করে বালিশের ওয়াড় বদলানো। এবিষয়ে সব ছেলেরই একটু গড়িমসি ও অনিচ্ছার ভাব। তবে যতটা দেরী করা যায় দেখে, আমরা চাদর-ওয়াড় বদলাতুম। রবি ও-পাট একেবারে তুলে দিলে। ফলে বালিশ ও বিছানার চাদর এমনি ময়লা, দুর্গন্ধ ও বিকট-দৃশ্য হয়ে উঠলো যে, মেসের আর-সকলে তার বিছানায় বসা দূরে থাক্‌, রবির ঘরেতে যাওয়াই বন্ধ করে দিলে বাধ্য হয়ে। কখনও-সখনও কাউকে যেতে হলে নাকে কাপড় ঢাকা দিয়ে যেতে হোতো।

রবি বুঝলে তার ঘর সকলে একপ্রকার বয়কট করেছে।

হঠাৎ একদিন সকালে একগাল হাসিমুখে রবি ঘরে ঘরে এসে আমন্ত্রণ জানালে—তোরা সব আয় আমার ঘরে। চাদর-ওয়াড়-সমস্যার একটা সন্তোষজনক সমাধান করে ফেলেছি।

আমরা ভাবলুম এতদিনে তা হলে একটা ফরসা চাদর পেতেছে, এবং ওয়াড়গুলোও পাল্টেছে।

গিয়ে দেখি বালিশ তুটো জড়িয়েছে স্টেট্স্ম্যান পত্রিকার তু'খানা বড় পাতায়; চাদরের ওপোর স্টেট্স্ম্যানের আরও তু'খানা দো-ভাঁজ পাতা। রবি দৈনিক স্টেট্স্ম্যান কাগজ একখানা করে নিতো।

সোল্লাসে রবি আমাদের বুঝুলে, রোজ এক সেট কাগজ ফেলে দেবে এবং নতুন এক সেট কাগজ জড়িয়ে ও বিছিয়ে দেবে। এরপর এবিষয়ে অনুযোগ করার আর কী থাকতে পারে!

রবি বেচারা তুষ্ট গ্রহের ফেরে পড়েছে। মেসের ঝামেলা এভাবে মেটাতে-না-মেটাতে কলেজের ক্লাসে বিপদ ঘনিয়ে এলো। রবি বরাবরই গরদের শার্ট পরতো। মোট তার চারখানা গরদের শার্ট ছিল। কিন্তু কাজে দেখা গেল একটা শার্ট-ই সে মাসের পর মাস পরে চলেছে। প্রথমে তুর্গন্ধের জন্যে কেউ তাকে পাশে বসতে দিলেনা। অগত্যা ক্লাসের শেষ বেঞ্চটায় সে একলা বসতে লাগলো। কিছুদিন পরে সমস্ত ক্লাস একযোগে প্রফেসরের কাছে নালিশ জানালে যে রবীন মজুমদারের শার্টের তুর্গন্ধে ক্লাসে বসা দায়—তাদের অন্নপ্রাশনের আহার্য উঠে আসার দাখিল।

রবি দাঁড়িয়ে উঠে বললে, এটা তার সতীর্থদের অতিশয়োক্তি ; পাছে কারও অসুবিধে হয়—এই ভেবে সে নিজের থেকে শেষের বেঞ্চে একলা বসে।

প্রফেসর চট্টরাজ রবিকে উঠে তাঁর কাছে আসতে বললেন ; কিন্তু রবি তাঁর দশ হাতের মধ্যে পৌঁছোতেই তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন—"Get out, get out, please !—বেরিয়ে যাও ক্লাস থেকে !" সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে রুমাল বার করে নিজের নাক চেপে ধরলেন।

শোনা যায় আপিসের অনেক কর্মচারী ওপরওয়ালাদের কাছে গাল খেয়ে বাড়ী ফিরে স্ত্রীর ওপোর মেজাজ দেখিয়ে তার ঝাল মেটায়। মেসে আর স্ত্রী কোথায় ? তা ছাড়া রবির এবং মেসের অধিকাংশেরই মূলেই হাবাত—তখনও বিয়েই হয়নি।

যাহোক্, স্ত্রীর next best substitute—নিকটতম বদ্‌লি হিসেবে রবি মেসে ফিরেই বিপ্‌নে চাকরটাকে সামনে পেয়ে তাকেই ঠ্যাঙাল-পেটা শুরু করে দিলে। বললে—এই ব্যাটাদের জন্যেই আমার আজ এই অপমান ! আমার চারটে গরদের শার্ট ; আর তিনটে গেল কোথা ? ডাইং-ক্লিনিং-এ কাচতে দিলুম, ব্যাটারা আর ফেরৎ আনলেনা ; ঐ ব্যাটারাই শার্ট তিনটে চুরি করেছে।

বিপ্‌নে মার খেয়ে মহা কান্নাকাটি সোরগোল আরম্ভ করলে। বললে—কখন আপনি শার্ট ডাইং-ক্লিনিং-এ দিতে দিলেন ? কারও কাপড় চুরি যাচ্ছেনা, শুধু আপনার শার্ট-ই চুরি করলুম আমরা !

যাক্, খানিক পরে রবি বিপ্নেকে সন্দেশ খেতে একটা টাকা বখশিশ করলে ; হাঙ্গামা চুকলো।

প্রভাত রবির সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু। প্রভাতও জলপাইগুড়ির ছেলে। সে অন্য মেসে থাকতো ; ছুটীর দিন সকালে রবির কাছে বেড়াতে আসতো আমাদের মেসে।

প্রভাত এলে, আমরা মজার ঘটনাগুলোর খবর তাকে দিলুম। রবিকে ক্লাস থেকে বহিষ্কার, বিপ্নেকে জুতো-পেটা ইত্যাদি।

সব শুনে প্রভাত জিগেস্ করলে রবির ঘরে কোনও পুরোনো, ছেঁড়া জুতো আছে কিনা। ঘরে গিয়ে দেখা গেল, খাটের তলায় দু'জোড়া ছেঁড়া, পরিত্যক্ত শূ্য ধুলো-ঝুল-ঢাকা পড়ে আছে। প্রভাত জুতো দু'জোড়া টেনে বার করলে ; এক এক পাটির মধ্যে হাত গলায় আর ময়লা দুর্গন্ধ এক-একটা গরদের শার্ট বেরিয়ে আসে। তিনটে জুতোর মধ্যে থেকে তিনটে শার্ট, আর এক পাটির ভেতর থেকে একটা সিল্কের গেঞ্জি উদ্ধার হোলো।

প্রভাত বললে—জামা ময়লা হলে ছেঁড়া জুতোর মধ্যে গুঁজে রেখে দেওয়া রবির চিরকেলে অভ্যেস।

নিরাময়ের দেবদূত

দেবেন ডাক্তারের অনেক গুণ। ডাক্তার হিসেবে অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ। শরীরে দয়ামায়া আছে; অর্থপিশাচ ন'ন। বেশ মিশুকে মিশুকে মজলিসী লোক। সন্ধ্যেবেলা বাড়ীতে দরবার বসান। শহরের কিছু গণ্যমান্য লোক তাঁর বাড়ী আসুক—চা-সিগ্রেট খাক; কোনও কোনও দিন শুধু নেশার উপরি কিছু খেয়ে যাক্—এটা তিনি চান এবং এজন্যে খরচে কার্পণ্য নেই। চিকিৎসাশাস্ত্র ছাড়া সাধারণ সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতির কিছু কিছু বই তিনি কেনেন,—এমনকি সময় পেলে তার কোন-কোনওখানা তিনি পড়েনও। বাংলা ও ইংরেজিতে বন্ধু-বান্ধবকে তিনি সরস ও সাহিত্যিক ভাষায় চিঠি লেখেন।

সংস্কৃতি ও মার্জিত রুচির এইসব বহির্লক্ষণ থাকলেও মানুষটি আসলে আদিম বন্য স্বভাবের। হঠাৎ ক্রোধে দপ্ করে জ্বলে ওঠেন—তখন বিকট চীৎকার এবং প্রায়ই অশ্রাব্য ভাষা আগ্নেয়গিরি থেকে লাভা-স্রোতের মতো তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে। দম্ভ ও অহমিকাও প্রচণ্ড। ভয়ানক খামখেয়ালী।

আমাদের পরিবারের তিনি শুধু ডাক্তারই ছিলেন না; ঘনিষ্ঠ সুহৃদ, প্রায় নিকট আত্মীয়ের তুল্য। আমার ওপোর ছিল তাঁর অপার স্নেহ।

আমি তখন ১৩।১৪ বছরের ছেলে; স্কুলে পড়ি। রাত্রি

একটা থেকে আমার সেজভাই-এর পেটে প্রচণ্ড যন্ত্রণা শুরু হোলো। খাট থেকে মেঝেতে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে। বাবা আমায় বললেন—যা, এখুনি দেবেন ডাক্তারকে সব বলে ডেকে আন।

রাত্রি প্রায় তিনটে। ডাক্তারবাবুর বাড়ী গিয়ে তাঁর কম্পাউণ্ডারকে ঘুম থেকে জাগালুম।

সে-বেচারা অত রাত্রে মনিবকে ওঠাতে ভয় পেলে। আমায় বললে—আপনি তো বাড়ীর ছেলের মতন ; দোতলার ঐ ঘরটায় ডাক্তারবাবু শোন ; আপনি একতলায় ঠিক জানালাটার নীচে দাঁড়িয়ে, 'ডাক্তারবাবু' 'ডাক্তারবাবু' বলে ডাকলেই জেগে উঠবেন।

তার উপদেশমতোই চললাম। দু'তিন ডাকের পরই কানে এলো ব্যাঘ্র-হুঙ্কার : কে রে ব্যাটা! এত রাত্রে বাড়ীর ভেতর ঢুকে হাঁকাহাঁকি শুরু করেছে।

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম : ডাক্তারবাবু, আমি ; বাবা আমায় আপনাকে ডেকে নিয়ে যেতে পাঠালেন।

—ওরে ব্যাটা, আমি কি তোর বাবার মাইনে-করা চাকর? দাঁড়াও—দেখাচ্ছি!

একটু পরেই বাঁ হাতে একটা টর্চ আর ডান হাতে একটা কাঠের হুড়কো নিয়ে নীচে উপস্থিত (বোধহয় রাগের চোটে শোবার ঘরের দরজার হুড়কোটা ভেঙে ফেলে, সেটা নিয়ে এসেছিলেন)।

—ব্যাটাকে মেরে হাড় ভেঙে শিক্ষা দিতে হবে— এই

বলতে বলতে আমার দিকে তেড়ে এলেন। কিন্তু সুমুখে এসেই টর্চটা আমার মুখের ওপোর ফেলতেই আমায় চিনতে পেরে বলে উঠলেন—আরে ছি ছি, কাকে কী বললাম; খোকা, তুই এত রাত্তিরে! ভ্যাখ্ বাবা, কিছু মনে করিস্না তোকে ব্যাটা বলেছি; তুই সত্যিই আমার ছেলের মতন, আমার ব্যাটার মতন।

আমি বললুম—তাতে আর কি হয়েছে, অন্ধকারে বুঝতে পারেননি।

তারপর সেজভাই-এর অসুখের কথা তাঁকে বললাম।

শুনে বললেন—একখানা গাড়ী চাই যে, বাবা; এক্ষুনি যেতে হবে।

আমি জানালুম—গাড়ী নিয়েই আমি এসেছি।

খুশী হয়ে মন্তব্য করলেন—খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছিস্।

সেই চটি পায়ে, খালি-গায়ে কোঁচার খুঁটটা জড়িয়ে স্টেথিস্কোপ্টা তুলে নিয়ে গাড়ীতে চড়লেন। কম্পাউণ্ডারকে বললেন—তুমি সাইকেল করে আমাদের পেছনে ওদের বাড়ীতে এসো। কী কী দরকার হবে বললে, তুমি এসে ডিস্পেন্সারি থেকে নিয়ে যাবে।

বাকি রাতটা ডাক্তারবাবু সেজভাই-এর চিকিৎসায় আমাদের বাড়ীতেই কাটালেন।

রাস্তায় একদিন সকালে বাবা দেখলেন সাইকেল-রিক্সার সীটে একজন চাকর-গোছের লোক বসে, আর তার পায়ের

কাছে পা-দানিতে উবু হয়ে বসে দেবেন ডাক্তার। চম্‌কে উঠে বাবা রিক্সাওয়ালাকে থামতে বললেন ; দেবেন ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলেন—এ কী অদ্ভুত দৃশ্য !

তিনি উত্তর দিলেন ঃ কী করবো বলুন ; চাকরটাকে ওর মনিব পাঠিয়েছে আমায় ডেকে নিয়ে যেতে ; ও ভাবলে, তার মনিব তো ডাক্তারকে টাকা দেবে, তাই আমার আগেই ও উঠে রিক্সার সীটে জাঁকিয়ে বসলে ; আমি তো আর ওর পাশে বসে যেতে পারিনা, অগত্যা পা-দানিতে বসে যাচ্ছি কোনওরকমে মান বাঁচিয়ে।

বাবা চাকরটাকে ধমক দিলেন ঃ তুই রিক্সার সঙ্গে হেঁটে হেঁটে যা ; ডাক্তারবাবুকে বসতে দে ; তোর কি কোনও জ্ঞান-আক্কেল নেই !

মাঝে মাঝে ডাক্তারবাবু সন্ধ্যায় আড্ডা জমাতে যেতেন বন্ধু রায়বাহাদুর শিব মিত্রের বাড়ী। একদিন যেতেই শিব মিত্র বললেন—দেবেন, দাঁতের যন্ত্রণায় বড্ড কষ্ট পাচ্ছি।

ডাক্তার ভরসা দিলেন কাল সকালেই দাঁতটা তুলে দেবেন।

দাঁতের যন্ত্রণা হলে, লোকে অন্য কথা কিছু ভাবতে পারেনা, অন্য কিছুতে মনোযোগ দিতে পারেনা। খানিক বাদে রায়-বাহাদুর আবার বললেন—দেবেন, দাঁত যে তুলবি, ভয়ানক লাগবে তো ; একটা কোকেন-ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে নিবি তো তোলার আগে ?

ডাক্তার খেঁক্‌রে উঠলেন ঃ বুড়ো হয়েছিস্‌ ; দাঁত সব হল্‌হল্‌

গল্‌গল্‌ করছে; তারই একটা তুলতে হবে; তাতে আবার এত রঙাই নাচ; কোকেন-ইন্‌জেক্‌শন! ছাই করবে।

রায়বাহাদুর ফাঁপরে পড়লেন; আবার একটু পরে খুঁতখুঁত করে বললেন: দেবেন, তা হলে তুই কিরকম ভাবে দাঁত তুলবি?

দেবেন ডাক্তার মুখের ভঙ্গি ভীষণ বিকট বীভৎস করে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—কী রকম ভাবে! সাঁড়াশিটা দাঁতের ওপোর সজোরে চেপে ধরে, প্রাণপণে হড়াৎ করে একটা হ্যাঁচকা টান মারবো; পটাং করে দাঁতটা উঠে আসবে: তোর মনে হবে মাথার সব শিরগুলো ছিঁড়ে গেল; তারপর দাঁত-মুখ দিয়ে গল্‌গল্‌ করে রক্ত বেরুবে।

শুনে শিব মিত্র বললেন—থাক্‌; তোকে আর আমার দাঁত তুলতে হবেনা; আমি কল্‌কাতায় গিয়ে দাঁত তুলিয়ে আসবো।

—দ্যাখ্‌ শিবে, বেশী বড়মানুষী দেখাস্‌নে; বুঝতুম কচি-বয়সের কাঁচা দাঁত; বুড়ো ফোকলা মুখের নড়বড়ে একটা দাঁত তোলাবার জন্যে কল্‌কাতা ছুটবেন।

এই বলে ডাক্তারবাবু রায়বাহাদুরের পুত্র অমরকে হাঁক দিলেন—এই অমর, তোর মার কাছ থেকে রুটি-স্যাঁকা চাটু নামাবার সাঁড়াশিটা নিয়ে, ওটা উনুনের ভিতর গুঁজে লাল করে নিয়ে আয় তো।

সভয়ে শিব মিত্র প্রশ্ন করলেন: ও-সাঁড়াশি দিয়ে তুই কী করবি?

—ভাবছি সারা রাতটা শুধু শুধু কষ্ট পাবি ; তার চেয়ে এখুনি ঐ সাঁড়াশি দিয়ে দাঁতটা তুলে দিই ; ঐটে দিয়েই চালিয়ে নেবো ; আর আগুনে পুড়িয়ে নিলেই অ্যান্টিসেপ্‌টিক হয়ে গেল।

রায়বাহাদুর গম্ভীরভাবে বললেন—তা হলে মুখটা একটু ধুয়ে আসি।

—তাই যা।

পাশের ঘরে পৌঁছেই রায়বাহাদুর দড়াম্ করে দরজায় খিল এঁটে দিলেন। জানলার কাছে এসে চেঁচাতে লাগলেন—খুনে কোথাকার! ডাক্তার না ব্যাটা জল্লাদ; তুই দূর হয়ে যা।

দেবেন ডাক্তার খিলখিল করে হাসতে লাগলেন—শিবে, বুড়ো হয়ে মরতে চললি, এখনও এত ভয়।

খানিক পরে ছেলেকে ডেকে রায়বাহাদুর খবর নিলেন দেবেনটা বিদেয় হয়েছে কিনা। চলে গেছে শুনে, ছেলেকে বললেন—অমর, আজই রাত ডুটোর ট্রেনে দাঁত তোলাতে কল্‌কাতা যাবো। তুই এখুনি একটা গাড়ীকে বায়না দিয়ে আয়। কাল সকালে এখানে থাকলে ঐ কসাই দেবেনটার হাতে পড়তে হবে।

সন্ধ্যে সেই হচ্ছে। তখনও আলো জ্বালা হয়নি। দেবেন ডাক্তার আর আমি তাঁর বাড়ীর বাইরের লম্বা বারান্দাটায় বসে গল্প করছি। মফস্বল থেকে গরুর-গাড়ী-বোঝাই একটি পরিবার এসে নামলো। একটি রোগী, বাকিরা তার স্বজন—মা, স্ত্রী, বড় ভাই, ছোট ভাই।

ডাক্তারবাবু রোগীকে দেখে এসে মুখটা ভেট্‌কে গম্ভীর হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলেন। তারপর আবার আমার সঙ্গে গল্প জুড়লেন।

রোগীর দাদা এসে ডাক্তারকে সকাতরে জিজ্ঞাসা করলে—ডাক্তারবাবু, কেমন দেখলেন; প্রাণের কোনও আশঙ্কা নেই তো?

দেবেন ডাক্তার চুপ করে নিরুত্তর বসে রইলেন।

লোকটি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নিরাশ হয়ে আবার রোগীর কাছে ফিরে গেল।

ডাক্তারবাবু আস্তে আস্তে আমায় বললেন: লিভার অ্যাব্‌সেস্ হয়ে ফেটে গেছে; ওর আর কিছু করার নেই।

কিন্তু রোগীর দাদা পনেরো-বিশ মিনিট অন্তর ডাক্তারেব কাছে আসে আর ঐ একই আকুল প্রশ্ন করে—ডাক্তারবাবু, আমার ভাই-এর প্রাণের কোনও আশঙ্কা নেই তো?

ডাক্তার তিন-চারবার প্রশ্নটি শুনে ধৈর্য ধরে নীরব ছিলেন।

যেই লোকটি আর একবার এসে তার ব্যাকুল প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করেছে, লাফিয়ে উঠে বিকট ভয়াবহ চীৎকার ছাড়লেন ডাক্তার—প্রাণের আশঙ্কা! মাত্র তিন-চার ঘণ্টার মধ্যে মারা যাবে, নির্ঘাত মারা যাবে।

সঙ্গে সঙ্গে রোগীটির পরিবারের সকলে গলা ছেড়ে বুক-ফাটা ক্রন্দন শুরু করলে।

নিজের কাজের পরিণাম দেখে, ভীত চকিত শশব্যস্ত দেবেন ডাক্তার বললেন—দেখ্‌লি বিনয়, কাজটা খুব খারাপ হয়ে

গেল। চল্ চল্, এখান থেকে পালিয়ে চল্।— এই বলে আমায় টানতে টানতে কোণের একটা ঘরে গিয়ে তাড়াতাড়ি দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন ; আমায় নির্দেশ দিলেন—একেবারে কথা বলিস্‌না : যেন টের না পায় আমরা এখানে আছি।

আমি হতভম্ব হয়ে সেই অন্ধকার ঘরটায় বসে রইলুম। ব্যাপারটা বুঝতে পারলুম না। ডাক্তারের কিসের ভয়, কাকে ভয়।

মিনিট-কয়েক পরে ডাক্তার-গিন্নীর গলা পাওয়া গেল : হাড়হাবাতে মিন্‌সে গেল কোথায় ?

ডাক্তার আমার ঠোঁট দুটোর ওপোর তাঁর একটা আঙুল চেপে ধরলেন।

হাতড়াতে হাতড়াতে ভদ্রমহিলা দরজা ঠেলে আমাদের ঘরে ঢুকলেন। আমায় দেখতে পেয়ে জিগেস্ করলেন—হ্যাঁরে বিনয়, বুড়ো-মিন্‌সে রাক্ষসের মতো চেঁচাতে চেঁচাতে কী বললে—আর ওরা বংশ-সুদ্ধু মড়া-কান্না জুড়লে ?

আমি রোগীর দাদার প্রশ্ন ও ডাক্তারের উত্তরের কথা তাঁকে জানালাম।

শুনে ডাক্তার-গিন্নী বললেন—মরলে তো ওরা কান্না জুড়তোই ; এ তিন-চার ঘণ্টা আগে থেকেই আমাদের অতিষ্ঠ হতে হোলো। সারাজীবন এইরকম হাড় জ্বালাচ্ছে। রোগী বাঁচবেনা এই কথাটা কি পিশাচের উল্লাস আর রাকুসে চীৎকার ছাড়া জানানো যায়না ?

ভক্তিমার্গে

ভক্তি-শ্রদ্ধার ব্যাপার হাস্য-পরিহাসের বিষয় নয়। তবু দু'একটা মজার ঘটনা চোখে পড়েছে—ভক্তিমার্গেও।

আমার এক মেসোমশাই তখনকার দিনের খুব চালু একজন ধর্মগুরুর চেলা হলেন। গুরু-সন্দর্শনে গিয়ে গুরুদেবকে ভক্তিগদ্‌গদ্ কণ্ঠে বললেন—"বাবা, আমায় একটু প্রেম দাও।"

গুরুদেব উত্তর করলেন—"যা, একটা কলসী কিনে নিয়ে আয়; নইলে প্রেম যে দেবো, রাখবি কোথায়।"

উপস্থিত সবাই হো-হো করে হেসে উঠলো। মেসোমশাই লজ্জায় গুম্ হয়ে বসে রইলেন। বাকি জীবনটা সবার উপহাসের পাত্র হয়ে পড়লেন, এবং শেষদিন পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারলেন না গুরুদেবের উত্তরের গূঢ় তত্ত্ব।

পাগল হরনাথের বড় শিষ্যা ছিলেন আমার এক সহপাঠীর মা। তাঁরই প্রভাবে সেই বংশের সকলেই পাগল হরনাথের শিষ্য-শিষ্যা হ'ন। আমরা তখন ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে পড়ি। সেবার পুরীতে খুব জমকালোভাবে পাগল হরনাথের জন্মোৎসব পালন ঠিক হয়েছে। আমাদের ঐ বন্ধু—বটু এবং তার বংশের সকলে মেদিনীপুর থেকে পুরী চলেছেন। বটুর জিদে, এবং তার মার অনুমতি পেয়ে আমরা—বটুর দুই বন্ধু, তাঁদের সঙ্গে পুরী রওনা হোলেম।

উৎসব সপ্তাহব্যাপী চলবে। সকাল থেকেই শিষ্য-শিষ্যার দল পাগল হরনাথ ও তাঁর পত্নী কুসুমমাতাকে ঘিরে, 'হর-কুসুম' 'হর-কুসুম' বলতে বলতে নেচে-নেচে ঘুরতে থাকে। এরই মাঝে এক-একজন ধপাস্ করে মাটিতে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। সকলে চীৎকার করে ওঠে—অমুক দশা পেয়েছে। যে যেদিন দশা পায় সেদিন তার খুব খাতির। সকলে তার পায়ের ধুলো মাথায় নেয়। সারাদিন তার সেবা ও উৎকৃষ্ট আহার চলে।

বটু আর আমরা দু'জন এসবের দর্শক মাত্র। দূরে বসে বা দাঁড়িয়ে ভক্তদের ক্রিয়াকলাপ দেখি। তৃতীয় দিন সকালে হঠাৎ বটু বললে, দেখেছিস্ দশা পেলে কিরকম মান-খাতির; খাওয়াটাও খুব ভাল পাওয়া যায়। দাঁড়া, আজ আমায় দশা পেতে হবে। বলার সঙ্গে সঙ্গেই বটু দলে ভিড়ে গিয়ে 'হর-কুসুম' 'হর-কুসুম' চেঁচাতে চেঁচাতে দু'একটা ঘুরপাক দিয়েই দড়াম করে আছড়ে পড়ে গোঁ-গোঁ শুরু করলে। সবাই শশব্যস্ত হয়ে বটুর পায়ের ধুলো নিলে—মায় বটুর মা-বাবাও, প্রথা-রক্ষার দায়ে। সকলে বটুর ধন্যি-ধন্যি করতে লাগলো; কিশোর ভক্তের প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ। সারাদিন বটুর সেবা ও ভূরিভোজন চললো। হাসিতে আমাদের পেট ফেটে যাবার যোগাড় হলেও ভয়ে চুপ করে থাকতে হোলো। মাঝে মাঝে নজরে পড়ছিলো বটুর মার ফরসা ধব্‌ধবে মুখখানা সিঁদুরের মতো লাল হয়ে রয়েছে, এবং থেকে থেকে তিনি আমাদের দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন।

রাত্রে বটু এবং আমরা দু'জন একটা ছোট ঘরে ঘুমুচ্ছিলুম। আধরাতে কে আমাদের ঝাঁকুনি দিয়ে তুলে দিলে। চেয়ে দেখি বটুর মা। দাঁতে দাঁত চেপে তিনি বললেন—হতভাগা, পোড়ার-বাঁদর সব, ধর্মক্ষেত্রে এয়েছ নচ্ছারি করতে। এই টাকা দিলুম, রাত থাকতে উঠে, ভোরের ট্রেনেই তোরা তিনজন মেদিনীপুর ফিরে যা। এখানে সব মুখ বুজে সহ্য করতে হবে। মেদিনীপুর ফিরে তোমাদের যা করবার করবো।

কথায় আছে—একযাত্রায় পৃথক ফল হয়না; নইলে আমাদের দু'জনের এর মধ্যে কোনও দোষই ছিলনা; সমস্তটাই তাঁর ছেলের দুর্বুদ্ধি। কিন্তু তবু আমরা তার সাথী ও সখা; নীরবে গঞ্জনা মেনে নিতে হোলো।

আমাদের স্কুলের পণ্ডিতমশাই ধর্মপ্রাণ বৈষ্ণব। তাঁর বাড়ীতে মহাপ্রভুর একটি মন্দির ছিল, এবং প্রতি রবিবার সেখানে নাম-সংকীর্তন হোতো। সেখানেও মাঝে মাঝে এক-একজন ভক্ত অজ্ঞান হয়ে পড়তেন—দশা পেতেন। আশ্চর্যের বিষয়, এই ভক্ত-সমাবেশের মধ্যে দু'জন উপস্থিত থাকতেন যাঁদের জগাই-মাধাই আখ্যা দিলে অত্যুক্তি হয়না। ধর্মবিষয়ে দু'জনেই ঘোর পাষণ্ড। প্রতি সন্ধ্যায় একটু করে কারণ পান করতেন দু'জনে। রবিবার-দিনও নাম-সংকীর্তনের আসরে বসে থাকতেন নেশায় বুঁদ হয়ে এই দুই ভদ্রলোক—হৈমজাবাবু ও নীরদবাবু।

এক রবিবার হৈমজাবাবু পকেট থেকে একটি বোমা (লোহার ছুঁচোলো দণ্ড, যা দিয়ে বস্তা থেকে চাল টেনে নিয়ে পরীক্ষা করা হয়) বার করে বেশ একটু উচ্চস্বরেই বললেন—দ্যাখ্ নীরদ, চালের গোলা থেকে এই বোমাটা এনেছি; আজ কোনও ব্যাটা 'দশা' পেলেই তার পাছায় প্যাঁট্ করে এটা ফুটিয়ে দেখবো ব্যাটার ভক্তি কত ইঞ্চি deep (গভীর); কতখানি ফোটানোর পর ব্যাটার জ্ঞান ফিরে আসে।

কথাগুলি শোনার পর ভক্তের দল ত্রস্ত, শঙ্কিত। অস্বস্তির হেতু সেদিন আর কেউ দশা পাওয়ার ভরসা পেলেন না। চতুর্দিকে প্রতিবাদের গুঞ্জন উঠলো: এই দুই নরাধম পাষণ্ড এই ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে উপস্থিত থাকে কেন।

পণ্ডিতমশাই কিন্তু উচ্চশ্রেণীর বৈষ্ণব; কারও প্রতি রূঢ় বাক্য বা আচরণ তাঁর বৈষ্ণবভাবের বিরুদ্ধ। শুধু আমাদের পরম দুর্ভাগ্য, ক্লাসে পণ্ডিতমশাই আমাদের প্রায়ই প্রচণ্ড প্রহার করতেন। আমাদের গাঁট্টা মারার বেলায় তিনি ছিলেন কট্টর শাক্তর চেয়েও শক্ত, কঠোর, নির্মম।

পণ্ডিতমশাই বললেন—ভাই হৈমজা, নীরদ, তোমাদের তো ভাই এখনও ধর্মে তেমন মতি হয়নি, তোমরা কেন ভাই প্রতি রবিবার এখানে আসো: অন্যসকলে তোমাদের দেখে একটু ভয় পাচ্ছেন।

নীরদবাবু বললেন—আরে পণ্ডিত, শুধু-শুধু কি আসি; এখানে মালপোটা ভারি চমৎকার তৈরী হয়; স্রেফ্ কয়েকখানা মালপো খাওয়ার লোভেই আমরা দু'জনে এখানে আসি।

পণ্ডিতমশাই পরম বৈষ্ণব ও দক্ষ কূটনীতিবিদ। তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন—এই যদি কথা, এবার থেকে প্রতি রবিবার সন্ধ্যের আগেই বেশ ক'খানা করে মালপো তোমাদের বাড়ীতে আমি পাঠিয়ে দেবো ; তোমাদের আর কষ্ট করে এখানে আসতে হবেনা।

শুনে হৈমজাবাবু আশ্বাস দিলেন : বেশ, তা যদি ঠিক পাঠিয়ে দাও, আমারাও আর ঝামেলা করতে আসবোনা।

প্রেসিডেন্সি-জেলে আমরা আট-খাতায় (ডেটিনিউ-ওর্য়ার্ডের জেল-পরিভাষা) আটক বন্দী। জেলের ডাক্তারের সাহায্য-কারী সাধারণ বন্দী সাধুচরণ। হাসপাতাল থেকে আমাদের ঔষধ-পথ্য নিয়ে আসে। খাঁসা নাদুস-নুদুস, গোলগাল চেহারা সাধুচরণের। কথায়-বার্তায়, চাল-চলনে খাস কলকাতার কৃষ্টি। একদিন জিগেস্ করি—সাধুচরণ, এখানে তোমার অবস্থান কী কারণ ?

সাধুচরণের মুখে খৈ ফোটে : কেন আর বলেন ; আপনাদের যেজন্যে জেলে আসা, আমারও ঠিক সেই একই কারণে। ফেরিঙ্গীর রাজত্ব, ফেরিঙ্গী সরকার ; ব্যাটারা দেব-দেবী, ধর্ম-ভক্তি কিছুই বোঝেনা। ব্যাটাদের বিচার মানে ঘোর অবিচার—নিরপরাধদের জেলে ভরে দিচ্ছে।

মশাই, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের পরে এই হতভাগ্য সাধুচরণের চেয়ে দক্ষিণেশ্বরের কালীমার এতবড় ভক্ত-সন্তান আর জন্মায়নি। রোজ রাতে মায়ের মন্দিরে যাই, আর মায়ের

পায়ে পড়ে কেঁদে গড়াগড়ি খাই—"মা, মা, তুই যদি সাধুচরণের মা, তবে তোর সন্তানের এই দুঃখ-দারিদ্র্য কেন মা! মা, তোর গায়ে এক-গা গয়না, আর তোর ছেলে সাধুচরণ করবে পান কারণ হাতে নেই তার এমন টাকা!"

বিশ্বাস করুন, মশাই, সন্তানের এই দুখ্যু আর কান্না মায়ের বুকে শেলের মতো বাজলো; মা আর এ চোখে দেখতে পারলেন না। একদিন অমাবস্যার রাত্রে মা কথা কইলেন; মার দু'চোখে জল; বললেন—"বাবা সাধুচরণ, তোর দুখ্যু আর সইতে পারিনা; এই নিয়ে যা আমার গায়ের সব গয়না।" নিজের হাতে মা গয়না খুলে আমার হাতে তুলে দিলেন। মা হয়ে কতদিন আর আমার মতন ভক্ত-সন্তানের বুক-ফাটা কান্না সহ্য করবেন বলুন?

কিন্তু এই ম্লেচ্ছ-ফেরিঙ্গী সরকারের পুলিশ আমায় গ্রেপ্তার ক'রে, মা-কালীর গয়না চুরি করেছি এই অপবাদ দিয়ে জেলে পাঠিয়ে দিলে।

দক্ষিণেশ্বরের কালীর অলঙ্কার-চুরির বিখ্যাত মামলার প্রধান আসামী সাধুচরণ সাতবছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল।

খরচা শুধু একটি পয়সা

হারু মোক্তার গন্না-কাটা। তাই ভীষণ নাকী সুরে কথা বলে। ভগবানের এতবড় মার সত্ত্বেও হারু মোক্তার তার বুদ্ধির জোরে বেশ তু'পয়সা কামায়। সে আজ থেকে অনেক বছর আগের কথা।

আদালতের উঠোনে বড় বটগাছটার তলায় একটা চৌকো কেরোসিন-কাঠের বাক্স সুমুখে রেখে, ছোট একখানা মাতুর পেতে, বক যেমন মাছ ওঠার প্রতীক্ষায় বিলের ধারে উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে, হারু মোক্তার তেমনি উৎসুকভাবে চোখ তুটো সার্চ-লাইটের মতো এপাশ-ওপাশ ঘুরোতে ঘুরোতে মক্কেল ধরার তালে বসে থাকতো। ধারে কাছে মক্কেলের মতো কাউকে ঠাওরালেই হারু মোক্তার বলতো—তোমার কী কেঁস ?

লোকটা কাছে এলেই কথাবার্তা শুরু করতো হারু মোক্তার।

পাড়াগাঁয়ের মক্কেল তু'চার কথার পরই আসল প্রশ্নটা করতো : খরচা কত পড়বে, বাবু ?

হারু মোক্তারের বাঁধা উত্তর ; আর এই উত্তরের টোপেই মাছের কণ্ঠায় বঁড়শি বিঁধতো—মক্কেলরা ধরা দিতো।

হারু মোক্তার উত্তরে বোলতো—খরচা কিচ্ছু না ; শুধু এঁকটি পঁয়সা।

সানন্দে বেচারা দেহাতী নিরক্ষর মক্কেল হারু মোক্তারের শরণাপন্ন হোতো।

ভদ্রলোকের এক কথা। হারু মোক্তার তার প্রথম নির্দেশ জারি করতো—যা, এঁকটি পঁয়সা দিয়ে একখানি কাঁট্রিজ কাগজ কিনে আন।

কাট্রিজ কাগজ কিনে আনলে হারু বোলতো—কিনে এনেছিস্ ; আঁচ্ছা, এঁবারে শুধু আঁটটি আনা দিয়ে একখানা মোক্তারনামা নিয়ে আঁয়।

মোক্তারনামা এলে, হারু কেরোসিন-কাঠের বাক্সটাকে টেবিল বানিয়ে খস্‌খস্ করে যা লেখবার লিখে ফেলে, সেটি মক্কেলের হাতে দিয়ে ফরমাস করে—যা, এইবার এঁটার ওঁপোর একটাকার এঁকখানা স্ট্যাম্প এঁটে নিয়ে আয়।

স্টাম্প-করা কাগজখানা নিয়ে মক্কেল ফিরলে, হারু মোক্তার বলে—নে, এবারে বাঁর কর্ আমার ফী, মাত্র চাঁর টাকা।

টাকা চারটি হাতে পড়লেই একগাল হেসে হারু মোক্তার বোলতো : নে, আর তোঁর কিছু খঁরচা নেই ; শুধু মুহুরীটা, আর পেঁশকার, আমলা-ফয়লাদের দেঁওয়ার জন্যে দু টাকা, আর দু টাকা—মাত্র চাঁরটে টাকা।

এতক্ষণে অনেক মক্কেলেরই ট্যাঁক খালি হয়ে পড়েছে। কাঁদন-মাদন হয়ে তারা বোলতো—ই বাবু, তুই আগু বুল্‌ছিলি কেনে খরচা শুধু একটি পয়সা ; এখন এতো টাকা পাবু কুথা।

হারু শান্ত স্নিগ্ধ সহানুভূতির স্বরে বোলতো—ও, তোঁর

বুঝি কাঁছের টাকা সব ফুরিয়ে গেছে। কিঁছু ভাঁবিস্না। কাঁল কি পরশু আঁর দশটা টাকা নিয়ে আঁসিস্। আমি তোঁর মোকর্দমার সব ঠিঁক করে দেবো। তুই যখন আমার কাঁছে এসে পড়েছিঁস্, মামলায় তোঁর খঁরচা কিছুই হবেনা—বঁুঝলি।

গ্রামের চাষী-ভুষি সরল মানুষ এরা; এমনিতেই খুব চালাক-চতুর হয়না, তায় মনা-কাটা হারু মোক্তারের ব্যাপার দেখে আর কথা শুনে 'থ' বনে গিয়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকতো। কেউ কেউ মাথা গুঁজে, নীচু গলায় ফিস্‌ফিসিয়ে বোলতো—বাবু, তুই যে বললি খরচা শুধু একটি পয়সা, আর বেবাক এতগুলা টাকা আমাদের দি করালি।

রঙ্গমঞ্চের রঙীন নেশায়

এম.এ. পরীক্ষা শেষ করে হপ্তা দু'তিনের জন্যে বেড়াতে গেলাম পুরীতে। উঠেছিলুম ভিক্টোরিয়া হোটেলে। একটা বড় ঘরে থাকতাম তিনজন ছোকরা—রতন, সতীনবাবু আর আমি। আলাপ হতেই সতীনবাবু বললেন—রতনের মা, বাবা, বোন, বৌদি নীচে দু'তিনখানা ঘর নিয়ে আছেন। রতনকে তাঁদের সঙ্গে রাখা সম্ভব নয়, তাই রতন একলা ওপোরে আমাদের সঙ্গে আছে।

জিগেস্ করলুম—রতনকে ওঁদের সঙ্গে রাখতে পারেন না কেন?

সতীনবাবু বললেন—কেন, তা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আপনি নিজেই টের পাবেন। রতনের মাথায় প্রচণ্ড ঝোঁক চড়েছে—পড়াশুনো ছেড়ে, রঙ্গমঞ্চে যোগ দিয়ে বিখ্যাত অভিনেতা হবে। রতনের বাবা শশীবাবু এজন্যে ওর মুখ দেখতে চান না। পরিবারের অন্যসকলে রতনের অহোরাত্র অভিনয়ের পার্টের আবৃত্তি শুনতে শুনতে ক্ষেপে যাবার যোগাড়। আপনার আমার অবস্থাও সঙ্গীন হয়ে উঠবে। শয়নে, স্বপনে, আহারে, বিহারে অনবরত অনর্গল রতন ভিন্ন ভিন্ন অভিনেতার—দেশের ও বিদেশের—ভিন্ন ভিন্ন পার্ট আবৃত্তি ও মক্স করে চলেছে। আপনাকে তার দর্শক ও শ্রোতা হতে হবে, এবং রতন অনুকরণে

কতখানি সফল হয়েছে তার রায় দিতে হবে। দিনে-রাতে অন্য কোনও বিষয় বা বস্তুতে মনোযোগ দেওয়ার অবকাশ মিলবেনা আমাদের রতনচাঁদের দৌলতে।

একবেলা যেতে-না-যেতে হাড়ে হাড়ে টের পেলাম সতীনবাবুর কথা কী পরিমাণ সত্য! যাকে বলে obsession, কোনও একটা চিন্তা কারও মগজে ভূতের মতন চেপে বসা, তার চূড়ান্ত উদাহরণ রতনের অভিনয়-সাধনা।

তিন সপ্তাহের তিতিবিরক্ত অভিজ্ঞতা থেকে দু'একটা এখনও যা মনে পড়ছে তাই বলি। রাত প্রায় দুটো বাজে। তিনজনে ঘুমিয়ে আছি। পাশের ঘরেই থাকতেন এক যুবক ডাক্তার, তাঁর স্ত্রী এবং তাঁদের একবছরের একটি শিশু। ডাক্তার আমাদের চেয়ে বয়সে ৬।৭ বছরের বড়। তাঁর স্ত্রী বি.এ. পাস করে ইতিহাসে এম.এ. পড়ছেন। তাঁকে আমাদের বৌদি বলতে হোতো। বৌদি গোলগাল ভারিক্কী চেহারা ও মেজাজের। টাইপ-টা (type) প্রবলা অবলার।

হঠাৎ হেঁচকা টান মেরে রতন ঘুম থেকে তুলে আমায় বিছানার ওপোর বসিয়ে দিলে। চেয়ে দেখি সতীনবাবুকে আমার আগেই উঠিয়েছে।

—ব্যাপার কী, রতন?

—কিছু নয়, দাদা; কয়েকটা পার্ট বোলবো, আর অভিনয় করবো; আপনারা দেখেশুনে বলবেন আমার ঠিক হচ্ছে কিনা।

নিজের খাটের ওপোর দাঁড়িয়ে রতন শুরু করলে আবৃত্তি

আর অভিনয়; দেশী ও বিদেশী নামজাদা অভিনেতা ও চিত্র-তারকাদের বিভিন্ন পার্ট; শিশির ভাদুড়ীর, দুর্গাদাসের, অহীন চৌধুরীর, নরেশ মিত্তিরের; রাডি ভ্যালির, ডগ্‌লাস ফেয়ার-ব্যাঙ্ক্‌স্‌, হ্যারল্ড লয়েড, চার্লি চ্যাপলিন, আরও কতজনের।

ঘুমে চোখ ঢুলে আসছে। মাঝে মাঝে রতনের মন রাখার জন্যে বিড়বিড় করে বলছি—বেশ ভালই অভিনয় হচ্ছে।

হঠাৎ দড়াম্‌ করে বারান্দার দিকের দরজাটা খুলে গেল। ভিতরে প্রবেশ করলেন মুক্তবেণী, রণরঙ্গিণী ডাক্তার-গৃহিণী। বীরাঙ্গনার হাতিয়ার হিসেবে হাতে একখানা ভারী, মোটা কেতাব।

ক্রুদ্ধকণ্ঠে বৌদি গর্জে উঠলেন—বুড়োধাড়ি সব, রাত দুটোয় মজলিশ বসিয়েছেন; ছোট ছেলেটার ঘুমোবার জো নেই; এতটুকু আক্কেল কি ভগবান দেননি আপনাদের!

আমি বলি—খামোকা আপনি আমাদের দু'জনের ওপোর রাগছেন। আমরা অগাধে ঘুমুচ্ছিলুম। রতন হিঁচড়ে ঘুম থেকে তুললে; অভিনয় মক্স শুরু করলে—আমাদের ওর শ্রোতা, দর্শক ও সমঝদার বানিয়ে।

খুব ক্ষেপে গেলেও বৌদির ন্যায়-বিচারের জ্ঞান লোপ পায়নি। আমাদের বেকসুর রেহাই মিললো। দুম্‌ করে বইখানা দিয়ে রতনের মাথায় এক-ঘা বসিয়ে বললেন—রতন ঠাকুরপো, ফের যদি টুঁ শব্দ শুনেছি তো রক্ষে রাখবোনা।

বৌদি প্রস্থান করলে, রতন কাঁচুমাচু হয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়লো নিজের বিছানায়। আমরাও বাঁচলাম সে-যাত্রা।

বিকেলে সমুদ্রের কিনার ঘেঁষে বেড়াতে চলেছি তিনজনে। রতনের অভিনয় সর্বক্ষণ সমানে চলেছে। আমরা দু'জনে সেদিকে তত নজর বা কান দিচ্ছিনা। হঠাৎ গম্ভীর গলায় ডাক শোনা গেল পিছন থেকে : শুনুন আপনারা।

পিছন ফিরেই দেখি একজন প্রৌঢ়, একজন যুবক, ও তাঁদের সঙ্গে দুটি রূপসী যুবতী।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বললেন—আপনাদের জন্যে কি ভদ্র-লোকেরা মেয়েদের নিয়ে 'বীচ্'-এ (beach) বেড়াতে পারবেন না? আরও লজ্জার কথা—আপনারা বাংলাদেশেরই যুবক।

কী সর্বনাশ! একি কথা!

সতীনবাবু ভদ্রলোককে জিগেস্ করলেন : এসব কী বলছেন? আমরা কী করেছি?

ভদ্রলোক—কী করেছেন! একেবারে ন্যাকা সাজছেন। জঘন্য ব্যবহার! মেয়েদের দেখে ঐ ছোকরা অতি ইতরের মতো কাণ্ড করলে।

ভদ্রলোক রতনকে দেখালেন।

রতন একেবারে আকাশ থেকে পড়লো : আমি—আমি কী করেছি?

ভদ্রলোক তেড়ে উঠলেন : কী করেছি! মেয়েদের দিকে আঙুল বাড়িয়ে, "সেই দুটি নীল আঁখি" বলে অসভ্যতা করা কি কোনও ভদ্রলোকের ছেলের কাজ!

কথাগুলো বলেই ভদ্রলোক দলবল নিয়ে হন্‌হন্ করে চলে গেলেন।

রতন বললে—আমি নিজের মনে পার্ট বলছিলুম—ওদের দেখিইনি।

রতন যা বললে সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু মন্দ যা হবার ততক্ষণে ঘটে গেছে। কোনও বিখ্যাত অভিনেতার একটি পার্ট থেকে রতন feeling দিয়ে আবৃত্তি করছিলো—অঙ্গভঙ্গি সহকারে—দুটো আঙুল বাড়িয়ে দিয়ে আবেগভরা কণ্ঠে—"সেই দুটি নীল আঁখি"। তাই থেকেই ঘটে গেল এই বিপত্তি।

বছর তিন-চার পরে, স্টার-থিয়েটারে একটি নাটক দেখতে গিয়েছিলাম। দেখি—রতন শিশির ভাদুড়ীর সঙ্গে একটি ছোটখাটো পার্টে অভিনয় করছে।

এস্পেশ্যাল (SPECIAL) বুড়ী

আমার মার একই মাসিমা ছিলেন। আমি তাঁকে বলতুম বড়দিমা। বর্ধমান জেলার কুলীনগ্রামের বসু রামানন্দের বাড়ীর মেয়ে। হুগলি জেলার হরিপালের মজুমদার-বাড়ীর বৌ। যখনের কথা লিখছি তখন আমি এম.এ. পড়ি, আর মায়ের মাসিমা বুড়ী বিধবা। তাঁর এক ছেলে আর জনকয়েক মেয়ে। কল্‌কাতায় যে দুই মেয়ের বিয়ে হয়েছিল, তাঁরা অবস্থাপন্ন—বাড়ী, গাড়ী সবই ছিল। ছেলের তখনও বিয়ে হয়নি। তবে মেয়েদের ছেলেমেয়ের সংখ্যা বেশ। তাই কল্‌কাতায় মার মাসিমা-বুড়ীর নাতি-নাতনী অনেক।

বাপের বাড়ীর বিষয়-সম্পত্তিও কিছু বুড়ী পেয়েছিলেন। কুলীনগ্রামের বাড়ীটাও তাঁর ভাগে পড়েছিল। তবে ছেলেকে নিয়ে বরাবরই বসবাস তিনি করতেন কল্‌কাতায়। তাই জমি-জায়গা, বিষয়-আশয় দেখাশোনার জন্য দু'এক মাস অন্তর নয় হরিপালে কিংবা কুলীনগ্রামে যাতায়াত করতেন। সঙ্গে সবসময় একজন ব্যাটাছেলে নিয়ে যেতেন—নয় ছেলে, নয় বোনপো, নয় ভাসুরপো, কিংবা বড় বড় নাতিদের কাউকে। কিন্তু রেল-স্টেশনে পৌঁছানোর মুহূর্ত থেকে রেল-স্টেশন পরিত্যাগের মুহূর্ত পর্যন্ত পুরুষ প্রহরীটিকে সভয়ে ও উৎকণ্ঠিত আশঙ্কায় তাঁর দু'শো গজ দূরেই দাঁড়িয়ে থাকতে হোতো।

ট্রেনেও তাঁর সঙ্গে পুরুষ প্রহরীর এক-কামরায় ভ্রমণ নিরাপদ ছিলনা।

বুড়ীর একটি পোষা কুকুর ছিল, আর একটি পোষা টীয়া-পাখী। এই বেজবান অসহায় জীব দুটিকে অন্য কারও জিম্মায় রেখে যেতে তাঁর মন সরতোনা। এরা তাঁর সঙ্গেই সর্বদা যাতায়াত করতো। মুশকিল হোলো এ-দুটির জন্যে রেল-কোম্পানীকে বাড়তি ভাড়া বা মাশুল দিতে তিনি দৃঢ়ভাবে নারাজ। এসব বোবা অবুঝ প্রাণীর জন্যে আবার চার্জ কি! তাঁর মতে এরা তো আর মানুষ নয় যে এদের রেলের মাশুল দিতে হবে—নিয়ম হচ্ছে মানুষ-পিছু এক-টিকিট। এ নিয়ম তাঁকে কে বললে, বা তিনি কোথা থেকে পেলেন সে নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই। সম্ভবতঃ রেল-কোম্পানী সম্বন্ধে তিনি যে-ক'টা নিয়ম ঠিক করেছিলেন সবগুলিই তাঁর নিজের মন বা মগজের গড়া। কিন্তু সেগুলি তাঁর কাছে স্বতঃসিদ্ধ সত্য এবং নিঃসন্দেহে সকল তর্কের অতীত। তাঁর পুরুষ সঙ্গী সহযাত্রীর চিত্ত কিন্তু এবিষয়ে সংশয়-সঙ্কুল।

যাক্, কল্‌কাতা থেকে যাওয়ার সময় ঝামেলা অনেক কম। সমস্যা মাত্র বিনা-মাশুলে একটি কুকুর ও একটি টীয়া-পাখীকে দুটি স্টেশন ও ট্রেনটুকু পার করা। সারা পথটা বুড়ী নিজেই তাদের কাণ্ডারী হতেন, এবং রেল-কোম্পানীর কোনও কর্মচারী ওদের জন্যে টিকিট বা মাশুল চাইলে ধম্‌কে দিতেন—তোমরা কী বাছা! শরীরে একটু মায়াদয়াও নেই; এরা আমার পোষা জীব, এদের কার কাছে রেখে আসি বলো, বাবা;

সঙ্গে করেই আসি-যাই। আর আমার তো ন'মাসে ছ'মাসে একবার যাওয়া নয়; শ্বশুরবাড়ীর বাড়ী-ঘর, বিষয়-সম্পত্তি, ঠাকুর, দোল-তুর্গোৎসব সব আমার ঘাড়ে, আবার বাপের বাড়ীর ওসব দায় আমার ঘাড়ে পড়েছে। আমায় তাই রেল-কোম্পানীর গাড়ীতে নিত্যি-নৈমিত্তি যাতায়াত করতে হয়। আমি তো আর তোমার কোম্পানীর উট্‌কো খদ্দের নই, আমি একজন বাঁধা খদ্দের।

তাঁর এই ধরনের কথাবার্তা থেকে বোঝা যেতো বুড়ীর বদ্ধমূল ধারণা তাঁর বরাদ্দ মুদীখানা, কয়লাওয়ালা, খাবার-ওয়ালার মতো রেল-কোম্পানীও আর-একজন ব্যবসাদার, এবং তিনি তার একজন বড় খদ্দের। এমনকি তাঁর হাতে কখনও পয়সা না থাকলে রেল-কোম্পানীর উচিত তাঁকে ধারে যাতায়াত করতে দেওয়া।

শেষমেষ বুড়ী যুবক রেল-কর্মচারীকে কুকুর ও টীয়া-পাখীর দরুন বাড়তি মাশুল চাওয়ার ধৃষ্টতার জন্যে বেশ বকে দিলেন—এইসব বোবা-হাবা পোষা জন্তু-জানোয়ারের জন্যে আবার মাশুল দিতে হবে! তোমার কোম্পানী এমন চশমখোর! চোখের পরদা বলে একটু নেই!

বেচারা রেল-কর্মচারী যুক্তি-ন্যায়-নিয়মের এইরূপ অপূর্ব ব্যাখ্যা শুনে খানিকক্ষণ ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে তাকিয়ে কুকুর ও টীয়া সমেত বুড়ীকে ছেড়ে দিত।

কিন্তু বৃহৎ ব্যাপার হোলো বুড়ীর কলিকাতা প্রত্যাবর্তন পর্ব। তিন-চারদিন আগে থেকে তোড়জোড় শুরু হোলো।

গাছ থেকে এককাঁদি ভাল ডাব পাড়িয়ে জমা রাখলেন। গোটা পঁচিশেক নারকেল ছোলা হতে লাগলো। বড় বড় বেল গোটা পঁচিশেক; চাল্‌তা গোটা পঁচিশেক; কয়েদ-বেল গোটা পঁচিশেক। আমড়া এক ঝুড়ি। ডুমুর এক ঝুড়ি। জেলেকে খবর গেল যাবার দিন ভোরে আধ-মণ মাছ ধরে দিয়ে যায় যেন। তারপর হঠাৎ মনে পড়লো বড় বেয়ান্‌ পাতলা খেজুর-গুড় খেতে বড় ভালবাসেন। বড়কে দিলে, ছোটকে বাদ দেওয়া যায়না। তাই দু'বেয়ানের জন্যে দু'নাগরী খেজুর-গুড় যোগাড় হোলো। ছোট বেয়াই তাঁর ক্ষেত-বাগানের শাক-সব্‌জির বড় সুখ্যাত করেন; বলেন—বেয়ান্‌, কল্‌কাতায় তো টাটকা কিছু খেতে পাইনা। আপনার সব জিনিস যেন মধু।— মিন্‌সের জন্যে কিছু শাক-পালা নিয়ে যেতে হবে। মালীকে বললেন—গাছ থেকে বেছে বেছে একঝুড়ি বেগুন তুলে নিয়ে আয়; কল্‌কাতা নিয়ে যাবো।

আর কী কী নিয়ে যাওয়া যায় সর্বদাই ভাবছেন। এখানে থাকলে তো সব পাঁচ-ভূতে খাবে; তবু নিয়ে গেলে তাঁর নাতি-নাতনীর পেটে যাবে—সার্থক হবে।

উকিল বোনপো সঙ্গে গেছ্‌লেন। বললেন—মাসিমা, তুমি তো নিয়ে যাওয়ার জন্যে রাজ্যের জিনিস জড়ো করছো। ওগুলোর লগেজ ও কুলী-ভাড়া যা পড়বে তার চেয়ে কল্‌কাতার বাজারে কিনে নিলে সস্তা হবে।

মাসিমা—হুঁঃ; লগেজ? লগেজ কে করছে; লগেজের জন্যে একপয়সাও খরচ করবোনা; সে তোকে ভাবতে হবেনা।

ভাবতে না বললেও উকিল বোনপো প্রমাদ গুণলেন। বুঝলেন একটা ভয়ানক বে-আইনী পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হবে।

কিন্তু রওনার আগের দিন মাসিমার সমাপ্তি-স্পর্শগুলি দেখে বোনপোর হৃৎকম্প উপস্থিত। বললেন—মাসিমা, তুমি কাল যেও ; এ যা ব্যাপার, তোমাকে তো একলাই যেতে হবে। আমি বিনা-লগেজে এই পাহাড়-পর্বত নিয়ে যেতে পারবোনা। আমি আজ সন্ধ্যের গাড়ীতে কল্‌কাতা ফিরে যাই।

মাসিমা বললেন—তা হয়না ; কাল আমার সঙ্গেই যাবি ; তোকে কিছু ঝামেলা পোয়াতে হবেনা। সব আমিই করবো ; আমি বলে হামেশা এই করছি। মুখের জিনিসগুলো কার জন্যে এখানে ফেলে যাবো বল্‌। কল্‌কাতায় তোরা দশজনে খেলে আমার বুকটা ঠাণ্ডা হয়।

হঠাৎ বুড়ীর মনে পড়ে গেল গোবিন্দ চাষী লাল ডাঁটার একটা ছোট ক্ষেত করেছে। গোবিন্দকে ডেকে বললেন আধখানা ক্ষেতের ডাঁটা উপ্‌ড়ে আনতে ; কাল কল্‌কাতা নিয়ে যাবেন। ঘণ্টা-কয়েক বাদে গোবিন্দ পর্বতপ্রমাণ এক-বোঝা লাল ডাঁটা দিয়ে গেল। সকালে বাগানের পুকুরে স্নান করতে গিয়ে দেখলেন শিমুলগাছগুলোয় সেবার খুব তূলো হয়েছে। চাকরকে তূলো বস্তায় ভর্তি করতে হুকুম দিলেন—কল্‌কাতা যাবে। দু'বোরা তূলো চললো।

যাত্রার আরম্ভ থেকেই উকিল বোনপোকে এমন স্নেহশীলা মাসিমাতাকে দুর্জনের পর্যায়ে ফেলতে হোলো, এবং তিনি সযত্নে মাসিমার সঙ্গ পরিহার করে চললেন।

বিভ্রাট বাধলো হাওড়া স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরুবার মুখে। সুমুখে চলেছেন বুড়ী মাসিমাতা, পিছনে সারি দিয়ে আটজন কুলী মাল-বোঝাই। নিজের টিকিটখানা চেকারের হাতে দিয়ে, আটজন কুলীর মাথার দ্রব্যসম্ভার দেখিয়ে বললেন—ওসব জিনিস আমার।

চেকার—লগেজের কাগজখানা দিন।

বুড়ী—লগেজ আবার কিসের! এসব আমার ক্ষেত-বাগানের ফল-পাকুড়, নিয়ে যাচ্ছি নাতি-নাতনীরা খাবে বলে: এর আবার লগেজ কি!

চেকার—এত মাল, এর জন্যে আপনাকে লগেজ দিতেই হবে।

বুড়ী—লগেজ দেব কেন? আমি কি এসব নিয়ে যাচ্ছি ব্যবসা করার জন্যে, না বাজারে বিক্রী করার জন্যে। এসব আমার দেশের জিনিস, এখানে ছেলেমেয়েরা খাবে। এর জন্যে লগেজ! তোমার কোম্পানীর এ কি নিয়ম! যত অনাছিষ্টি কথা! পথ ছেড়ে দাও।

লক্ষ্য করার বিষয়, বুড়ী তাঁর নিজের মন-মগজের তৈরী আর-একটা কানুন এখন রেল-কর্মচারীদের বাতলে দিলেন। শুধু ব্যবসায়ীদের কাছ থেকেই রেল-কোম্পানী মালপত্রের জন্যে লগেজের মাশুল আদায় করতে পারে। অন্য ক্ষেত্রে নয়।

ইত্যবসরে তুলোর দু'বস্তা এক ছোকরা চেকারের নজরে পড়লো। সে বললে—দু'বস্তা তুলোও তো রয়েছে ওর মধ্যে; ওগুলোও কি আপনার নাতি-নাতনীরা খাবে?

বুড়ী—ও তো আমার ‘বেডিং’—বিছানা ; বিছানা তো সব সময় ছাড়্।

চেকার—তূলোর তুটো বস্তা হোলো আপনার বেডিং !

বুড়ী—বলি বাছা, ও একই হোলো। তূলোগুলো দিয়ে বিছানা বানাবো বলেই তো এনেছি। ওতে আমার আর কি ছেরাদ্দ হবে! রেল-কোম্পানীর এই ছোঁড়াগুলোর ঘটে যদি একটু বুদ্ধি থাকে !

কথা শুনে চেকারের দল হো-হো করে হেসে উঠলো।

চেকার—কিন্তু লগেজ-ভাড়া না দিলে তো আপনাকে যেতে দেওয়া হবেনা।

বুড়ী—কী! এতবড় আস্পর্ধা! বসু রামানন্দের বাড়ীর মেয়ে, মজুমদার-বাড়ীর বৌকে এই ছত্রিশ-জাতের হাটের মাঝখানে আট্‌কে রাখবে! রেলে কি আজকে নতুন চড়ছি। তোমার কোম্পানী আমায় চেনেনা? কোম্পানীকে বোলো—ক্ষেত-বাগানের জিনিসের লগেজ কখনও দিইনি। আজ তোমরাই শুধু-শুধু হুজ্জোত পাকাচ্ছো। ভাল চাও তো পথ ছেড়ে দাও।

ততক্ষণে চেকারের গাঁদি লেগে গেছে বুড়ীর চারপাশে। অনেক কথা চালাচালির পর তাদের মধ্যে সর্দার-গোছের একজন বললে—দে, ছেড়ে দে ; দেখছিস্‌না, ও এস্পেশ্যাল (special) বুড়ী ; বহুবছর এমনিই যাতায়াত করছে।

সবাই বলে উঠলো—আচ্ছা, এস্পেশ্যাল (special) বুড়ীকে ছেড়ে দাও।

উকিল বোনপো এতক্ষণ দূরে দাঁড়িয়ে সত্রাসে সমস্ত দৃশ্যটি দেখছিলেন। বুড়ীকে বিজয়িনীর গর্বে কুলী-বাহিনীকে নিয়ে বাধা অতিক্রম করে আসতে দেখে—ছুটে মাসির পাশে হাজির হলেন।

বড়দিমা প্রায়ই জাঁক করে বলতেন—জানিস্, আমি 'এস্পেশ্যাল বুড়ী'। রেল-কোম্পানীর ছোঁড়াগুলো আমায় ঐ নাম দিয়েছে।

আমরাও অনেকে মাঝে মাঝে তাঁকে 'এস্পেশ্যাল বুড়ী' বলে ডাকতুম।

শুধু ইংরেজি বলার জোরে

ধীরেন ব্যানার্জী সেদিন এলো হঠাৎ আমার আপিস-ঘরে দেখা করতে আমার সঙ্গে প্রায় ত্রিশ বছর পরে। ঠিক চিনতে পারছি কিনা সেবিষয়ে তার মনে বিশেষ সংশয়। আমি তাকে সন্দেহাতীত করার জন্যে বললুম—তোর আই.এ. পরীক্ষায় বাংলার প্রশ্নপত্রে ছিলো দুর্গাপূজা সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ (essay) লিখতে ; তোর কাতর বার্তা পেয়ে শেষে একটি বাংলা প্রবন্ধের পুস্তক থেকে দুর্গাপূজা বিষয়ের রচনাটির পাতাগুলি ছিঁড়ে তোকে পরীক্ষার হলে পাঠাতে হোলো ; সেসব কি আমি ভুলে গেছি। উল্লসিত হয়ে বলে উঠলো—এইবার বুঝেছি ঠিক চিনেছ। বললে, সে এখন পশ্চিমবাংলার বৃহত্তম জেলার পুলিশ-সুপারিন্‌টেণ্ডেন্ট নাকি।

আশ্চর্য হতে পারেন, মাতৃভাষায় যার জ্ঞানের বহর ঐরকম, তার চাকরি এবং ঐরূপ পদোন্নতি হোলো কি করে। শুধু ইংরেজি বলার জোরে।

ধীরেন ব্যানার্জী স্কুলে আমাদের ক্লাসেই পড়তো। কলেজের অধ্যাপক হয়ে যখন গেলুম, দেখি ধীরেনও আমার একজন ছাত্র। মাঝের ক'বছরে ধীরেন রবার্ট ব্রুসের অধ্যবসায় নিয়ে স্কুলের বাকি ক্লাসগুলো এবং প্রবেশিকা পরীক্ষাটা ডিঙিয়ে এসেছে।

ধীরেনের বাবা বিচক্ষণ সাংসারিক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি; বুঝলেন তাঁর ছেলের ওপোর মা-সরস্বতী বিরূপা, তাই কলেজের পড়া চলতে-চলতেই ছেলের জন্যে মা-লক্ষ্মীর আরাধনার একটা বন্দোবস্ত করে দিলেন। ধীরেনকে মোটর-ড্রাইভিং শিখিয়ে, একটা পুরোনো ফোর্ড গাড়ী কিনে দিলেন শস্তায়। সেইটে শহরে ভাড়া খাটিয়ে মাঝে মাঝে পড়ার ফাঁকে ফাঁকে দু'পয়সা রোজগার করবে।

কবি নবীনচন্দ্রের 'মানবের অদৃষ্ট' কবিতার কয়েক ছত্র আজ চল্লিশ বছর বাদে মনে পড়ে যাচ্ছে—

মানুষের অদৃষ্টে প্রবেশিয়া অনায়াসে
কে বলিতে পারে;
বিপদ ভুজঙ্গ-প্রায় গরল-মণ্ডিত কায়
গরজিয়া আসিতেছে হায়;
অভাগারে দহিতে জন্মের মতো
দংশিয়া মরমে।
কিংবা অন্তরালে বসি সৌভাগ্য-সুন্দরী
ফুলমালা করে;
বরিবে আদরে বরে যথা স্বয়ম্বরে
সলাজে কুসুম-হারে
নারী-কুলেশ্বরী।

ভাড়াটে ভাঙা ফোর্ড-ই খুলে দিলে ধীরেনের সৌভাগ্যের সিংহদুয়ার। অবশ্য সবটাই ভাগ্য নয়, পুরুষসিংহের উদ্যোগ—ধীরেনের ইংরেজি বলার জোরটাও ভুললে চলবেনা।

এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার; ধীরেনের বাবা ছিলেন শহরের একজন বহুজনপরিচিত পুলিশ-কর্মচারী।

সাহেব পুলিশ-সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মিঃ নীলসনের নিজের মোটরখানা বিগড়ে অচল হয়েছিল। মফস্বলে জরুরী তদন্তে তাঁকে যেতে হবে। শহরে একখানা মোটর ভাড়া পাওয়া যায় কিনা এবিষয়ে লোককে প্রশ্ন করায় একজন তাঁকে জানালেন —কেন সাহেব, তোমার একজন অধস্তনের ছেলেই তো একখানা মোটর ভাড়া খাটায়।

খবরটা পেয়ে খুশী হয়ে মিঃ নীলসন একজন দারোগাকে পাঠালেন ধীরেনকে ডেকে আনতে। ধীরেন আসতে সাহেব বললেন—তুমি আমাদের অমুকের ছেলে; তুমি একটা ভাড়া-খাটা মোটর চালাও; খুব ভাল হয়েছে। আমায় আজই অমুক জায়গায় নিয়ে যাবে, এবং ফিরিয়ে আনবে; what fare would you charge?—কত ভাড়া নেবে?

ধীরেন—Fare! You father-mother; no fare.

সাহেব ধীরেনের ইংরেজিতে হক্‌চকিয়ে উঠে দারোগার দিকে চাইলেন।

দারোগা—সাহেব, ও বলছে তুমি ওর মা-বাপ; তোমার কাছে ও ভাড়া নেবে কি করে।

সাহেব—Father I can understand; but how am I mother also?—বাপ-টা না-হয় বুঝতে পারি, কিন্তু আমি আবার মা কী করে হোলুম?

সাহেব ধীরেনের দিকে ফিরে জিগেস্ করলেন—Dhiren, am I your mother ?—ধীরেন, আমি কি তোমার মা হই ?

ধীরেন—Yes Sir, You are my mother.—হ্যাঁ, সাহেব, তুমি আমার মা।

সাহেব হো-হো করে হেসে গড়িয়ে পড়লেন। মেমসাহেবকে ঘরের মধ্যে থেকে টানতে টানতে এনে ধীরেনের সুমুখে দাঁড় করিয়ে জিগেস্ করলেন : Dhiren, is she your father-mother ?—ধীরেন, এ কি তোমার মা-বাপ ?

ধীরেন তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে—No, she mother—না, উনি মা।

সাহেব—Is she not your father ?—এ কি তোমার বাপ নয় ?

ধীরেন—No—না।

আমাদের খুব চল্‌তি কথা—গরীবের মা-বাপ—সেটাই ধীরেন তার অনবদ্য ইংরেজিতে তর্জমা করে বলেছিলো—"You father-mother"। কিন্তু সাহেব এতে প্রচণ্ড কৌতুক খুঁজে পেলেন। সেই মুহূর্ত থেকেই ধীরেনের কপাল খুললো।

সাহেব বললেন—ধীরেন, তোমাকে তোমার প্রাপ্য ভাড়া আমি নিশ্চয় দেবো ; আমার কাছে ভাড়া তুমি নেবেনা কেন ?

ধীরেন—No, Sir, no ; you master ; you angry father's work not ; whole family sit on road.

সাহেব আবার থতমত খেয়ে দারোগার মুখের দিকে চাইলেন।

দারোগা বোঝালেন—ও বলছে, তুমি হোচ্ছো মনিব ; তুমি যদি চটে যাও—ওর বাবার চাকরি খেতে পারো। তখন ওদের সমস্ত পরিবার পথে বসবে। তাই ওর তোমার কাছে ভাড়া নিতে ভরসা হচ্ছেনা।

সাহেব ধীরেনের পিঠ চাপড়ে বললেন—তুমি কি পাগল! আমার কাছে গাড়ীর ভাড়া নিলে তোমার বাবার চাকরি যাবে কেন! যাক্‌, আমি তোমায় পঞ্চাশ টাকা ভাড়া দেবো। কিন্তু তোমার গাড়ী ঠিক আছে তো ; পথে accident হবেনা তো?

ধীরেন—Accident! I life give before you accident.

ধীরেনের এই ইংরেজির তোড়ের মুখে সাহেব সভয়ে আর-একবার দারোগার দিকে তাকালেন।

দারোগা—ও বলছে তোমার কোনও দুর্ঘটনা হওয়ার আগে ও ওর নিজের জান দিয়ে দেবে।

সাহেব—তাই নাকি! খুব ভাল কথা বলেছে, খুব ভাল কথাই বলেছে ; তবে ওর ইংরেজিটা আমার পক্ষে বড্ডই শক্ত। আমারই দোষ। তুমি তো দেখছি সব ঠিক বুঝে নিচ্ছো।

এরপর থেকে কিন্তু অবসর পেলেই সাহেব ধীরেনকে ডেকে পাঠাতেন, এবং সাহেব-মেম দু'জনেই ধীরেনকে নানারকম খাবার খাইয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধীরেনের অপূর্ব ইংরেজি শুনতেন আর হেসে গড়াগড়ি দিতেন।

সাহেব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ধীরেনের পড়াশুনোর কথা জেনে

নিতেন। পরীক্ষায় প্রশ্নের উত্তর ইংরেজিতেই লিখতে হয় জেনে মিঃ নীলসন বললেন—ইংরেজি ভাষায় তোমার কী পরিমাণ পারদর্শিতা তা তোমার পরীক্ষকদের চেয়ে আমি ঢের বেশী জেনে ফেলেছি। তুমি পরীক্ষার পাঁচিল পার হতে পারবে বলে আমার বিন্দুমাত্র ভরসা হচ্ছেনা। তবে তুমি ভেবোনা। এখান থেকে চলে যাওয়ার আগেই তোমায় আমি সাব-ইনস্পেক্টারের চাকরি দিয়ে যাবো।

সাহেবসুবোর কথার নড়চড় হয়না। ধীরেনের ইংরেজি বলার ভঙ্গীতে মোহিত মিঃ নীলসন তাকে দারোগার পদে বহাল করে গেলেন। সেই থেকেই ক্রমশঃ ধীরেনের আজ এতদূর পদোন্নতি।

সুন্দরীর উপরোধে

নীলু, আমি, শিবশঙ্কর আবাল্য বন্ধু ; নীলু এক ক্লাস নীচুতে পড়লেও আমরা দিনরাত একসঙ্গে গল্পগুজব, আলাপ-আলোচনা, খেলাধুলা করতুম। নীলু তাই আমাদের সহপাঠীরই সমতুল্য। সময়ের ধাক্কায় কিন্তু তিনজন তিনদিকে ছিট্‌কে পড়লুম।

একটু বেশী বয়সেই নীলু ভাব করে এক দীর্ঘদেহী সুন্দরী তরুণী—এম্.এ. ক্লাসের ছাত্রীকে বিয়ে করলে। তিনি ছোটবেলায় কনভেন্টে পড়তেন, তাই ইংরেজি উচ্চারণ খাঁটি মেমসাহেবী।

নীলু রূপসী পত্নীর গরবে ডগমগ। দশজনকে বৌ দেখাতে ভালবাসে। দরকার হলে, দেখিয়ে কাজ হাসিল করতেও পেছ্‌পা নয়। নীলু নিজেও সুদর্শন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরেই নীলুর কল্‌কাতার উপকণ্ঠে মাথা গোঁজার মতো একটা ছোট বাড়ী তৈরীর ইচ্ছে হোলো। তখন সিমেণ্ট আর লোহা দুইয়েরই বড় কড়াকড়ি।

শিবশঙ্কর তখন বাংলা-সরকারের একজন মাথা-ইঞ্জিনীয়ার। নীলু তার কাছেই হাঁটাহাঁটি শুরু করলে।

বিশালবপু, হেঁড়ে-গলা শিবশঙ্কর পাইপ টানছে আর কাজের মধ্যে ডুবে আছে ; সর্বদা শশব্যস্ত, হন্তদন্ত। রাফ্‌সাফ্ লোক শিবশঙ্কর, রসকষ কম। সোজা নীলুকে বলে

দেয়, তার দ্বারা কিছু সম্ভব নয়। সিমেণ্ট-লোহার পারমিট-লাইসেন্স পাওয়া খুব শক্ত। কোন কোম্পানী বা কনট্রাক্টারকে তার বলা উচিত হবেনা। নীলু নাছোড়বান্দা; বলে—তুই একটা অতবড় সরকারি ইঞ্জিনীয়ার, ইচ্ছে করলেই আমার এই সামান্য লোহা-সিমেণ্ট যোগাড় করে দিতে পারিস্। তবু অনেকবার গিয়েও নীলু গোঁয়ার-গোবিন্দ শিবশঙ্করকে নড়াতে পারলেনা।

হঠাৎ একদিন বিকেল চারটে নাগাদ শিবশঙ্করের আপিস-ঘরে এক সুবেশা সুন্দরী তরুণীর আবির্ভাব—মুখে তাঁর ইংরেজিতে খৈ ফুটছে। কাঠখোট্টা ইঞ্জিনীয়ার শিবশঙ্করের আপিসে কোনও তন্বীর আগমন বোধহয় এই প্রথম। হকচকানিটা সামলাবার আগেই আগন্তুকা শুরু করলেন—আমি অনেকের কাছেই শুনেছি আপনি মেয়েদের প্রতি বড়ই দরদী ও সমবেদনশীল। কত মহিলাই আমায় বলেছেন আপনার কাছে কিছু চেয়ে কখনও বিফল হয়ে যাননি। সব মানুষেরই এইরকম হওয়া উচিত।

বিমূঢ় শিবশঙ্কর অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। এর আগে কোনও একজন মহিলাও তার কাছে কিছু সাহায্য চাইতে এসেছিলেন বলে মনে পড়েনা।

অতিথি বলে চলেন—আমার অবস্থা শুনলে আপনার চোখে জল আসবে: আমায় ধরতে পারেন একজন প্রায়-বিধবা বা প্রাক্-বিধবা হিসেবে। স্বামী রোগ-জীর্ণ। দৌড়-ধাপ তো দূরের কথা, হাঁটতে-চলতেও তিনি হাঁপিয়ে

ওঠেন; দু'তিনটি কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে দুনিয়ায় আমি একলা মেয়েমানুষ।

স্তব্ধ হয়ে চেয়ে বসে আছে শিবশঙ্কর, যেন একটা পাথরের চাংড়া। হঠাৎ চম্‌কে ওঠে শিবশঙ্কর; ভদ্রমহিলা নিজের অবস্থা যা বর্ণনা করছেন তা নিশ্চয় বড়ই দুঃখের ও করুণ; কিন্তু ওঁর চোখে মুখে একটা চাপা কৌতুকের আভাস কেন!

আবার আরম্ভ করলেন রবাহূতা—বিশ্ব-সংসারে আমার পাশে দাঁড়ানোর আজ আর কেউ নেই; এখন আপনিই আমার একমাত্র ভরসাস্থল, একমাত্র গতি।

অপরিচিতার ভাষার ভঙ্গী ও তার তির্যক্ ইঙ্গিতে উৎকণ্ঠায় প্রাণ প্রায় কণ্ঠাগত শিবশঙ্করের, দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম। শুক্‌নো কাঠ-গলায় জিগেস্ করলে—আপনার জন্যে আমি কি করতে পারি বলুন?

মহিলা—একটা মাথা-গোঁজার জন্যে ছোট বাড়ী তৈরী করতে চাই; আপনি যদি ক'টন লোহা আর সিমেণ্টের বন্দোবস্ত করে দেন, চিরঋণী থাকবো আপনার কাছে। পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়— বলে ঠিকানা-লেখা স্লিপটা দিলেন।

হাঁপ ছেড়ে, সোজা হয়ে বসে শিবশঙ্কর। ক'টন সিমেণ্ট আর লোহা—মামলা খুবই সাধারণ ও সামান্য। ঝন্‌ঝন্ করে একটার পর একটা ফোন করে চলে পাগলের মতো শিবশঙ্কর—লোহা-সিমেণ্টের কনট্রাক্‌টার আর কোম্পানীগুলোকে। বলে, এটা আমার নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে চাইছি—দিতে পারলে কৃতজ্ঞচিত্তে আপনার উপকার স্মরণে রাখবো।

ফোন-করা শেষ করে আগতা রহস্যময়ীকে বললে শিবশঙ্কর—তিনটে জায়গায় সিমেন্টের, আর তিনটে জায়গায় লোহার কথা বলে দিলুম। সবাই পাঠিয়ে দেবে বলেছে।

উচ্ছ্বসিত হাসির আবেগ দমন করতে করতে লাবণ্যময়ী বললেন—দেখুন, আমার চাহিদা অল্প ; তিন জায়গা থেকে তিন কিস্তী এসে পড়লে কী করবো ভাবছি।

অপ্রস্তুত হোলো শিবশঙ্কর ; ঝোঁকের মাথায় ফোন করে যাচ্ছিলো, এদিকটা ভেবে ছাখেনি। সুন্দরীর উপরোধে গোগ্রাসে ঢেঁকির পর ঢেঁকি গিলে চলেছিলো।

সহাস্যে তরুণী বললেন—আপনি আমার জন্যে যা করলেন—কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই! আপনার সঙ্গে আমার স্বামীর পরিচয় করিয়ে দেওয়া উচিত। তিনি বাইরেই অপেক্ষা করছেন ; আমি নিয়ে আসছি।

তিন-চার মিনিট পরে যুগলে ঘরে ঢুকতেই শিবশঙ্কর চেয়ার ছেড়ে লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে উঠলো—নীলু—শূয়োর, পাজি, হতভাগা, গাধা ; বৌকে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে আড়ালে বসে আছিস্!

শিবশঙ্কর এর আগে নীলুর বৌকে কখনও ছাখেনি। নীলু কল্‌কাতায় থাকতো, শিবশঙ্কর বাইরে ছিল বহুবছর।

বললে নীলু—ভাগ্যে মাথায় বুদ্ধিটা খেলে গেল। বৌকে পাঠাতেই একদিনেই বাজীমাৎ। আমি তো দিনের পর দিন এসে পায়ের চেটো খুইয়ে ফেললুম, কিছুই করলি না। বার্নার্ড শ' লিখেছেন, "যীশু বললেন—নিজেকে যেমন ভালবাস,

তোমার প্রতিবেশীকেও তেমনি ভালবাস। আমরা আমাদের প্রতিবেশীদের ঘৃণা করি, কিন্তু প্রতিবেশীর পত্নীর প্রতি আমাদের অনুরাগ।” তোর বেলাও বলা যায়—বন্ধুর প্রতি বড়ই বিরাগ, কিন্তু বন্ধুপত্নীর প্রতি প্রীতির শেষ নেই।

শিবশঙ্কর—চুপ কর্, নচ্ছার!